এপ্রিল ২০২৬ ■ চৈত্র ১৪৩২-বৈশাখ ১৪৩৩

# নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা






আরমান রহমান তাজিম, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, মোহাম্মদপুর বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা



রামিসা মালিয়াত, সপ্তম শ্রেণি, আলতুন্নেসা স্কুল বাড্ডা, ঢাকা

# সম্পাদকীয়

এসেছে বাংলা ১৪৩৩ সাল। বৈশাখ মাসের প্রথম দিনটি নতুন বাংলা বছরের সূচনা করে। পহেলা বৈশাখ বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, এক অনন্য প্রতীক। নতুন আলো, নতুন আশা আর নতুন স্বপ্ন নিয়ে শুরু হয় নববর্ষ। ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ।

পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে শহর-গ্রাম সবখানেই মেলা বসে। এ বৈশাখি মেলায় মাটির তৈরি পুতুল, খেলনা, হাতপাখা, চুড়ি, চিড়া, মুড়ি, খই, বাতাসা ও বিভিন্ন ধরনের মিষ্টিসহ ঘরের প্রয়োজনীয় নানান জিনিসপত্রও পাওয়া যায়। নাগরদোলা, পুতুলনাচ, সার্কাস ও বায়োস্কোপ এই মেলার প্রধান আকর্ষণ। এছাড়া ব্যাবসায়ীদের হালখাতা আয়োজন আর নদীতে নৌকা বাইচের উন্মাদনায় মেতে ওঠে সবাই।

কালবৈশাখি ঝড় বৈশাখের এক প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ। ঝড়ো বাতাস যেন পুরোনোকে উড়িয়ে নতুন করে সব সাজিয়ে দেয়। এ সময় তাপমাত্রা অনেক বেশি থাকে। গ্রীষ্মকালেই পাওয়া যায় বিভিন্ন রসালো ও মিষ্টি ফল। প্রচণ্ড গরমে আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, তরমুজ, বেল, আনারসসহ, বিভিন্ন ফল আমাদেরকে স্বস্তি দেয়। এসব ফল খেতে যেমন মজা-তেমনি রয়েছে অনেক পুষ্টিগুণও।

ভালো থেকো বন্ধুরা, নবারুণের সাথেই থেকো, সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা।


**প্রধান সম্পাদক**
খালেদা বেগম

**সিনিয়র সম্পাদক**
শাহিদা সুলতানা

**সম্পাদক**
চৌধুরী সাহেলা পারভীন

**সিনিয়র সহসম্পাদক**
শাহানা আফরোজ

**সহসম্পাদক**
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
মেজবাউল হক

**সহযোগী শিল্পনির্দেশক**
সুবর্ণা শীল

**অলংকরণ**
নাহ্‌রীন সুলতানা

**সম্পাদকীয় সহযোগী**
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

**যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা**
☎ ০২-৮৩০০৬৮৮
editornobarun@dfp.gov.bd

**বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী**
**সহকারী পরিচালক**
☎ ০২-৮৩০০৭০২

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd

**মুদ্রণ :** মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

**মূল্য: ২০.০০ টাকা।**




# সূচি

## নিবন্ধ


০৫ বাঙালির আত্মিক শিকড় পহেলা বৈশাখ
অ আ আবীর আকাশ
১৩ নববর্ষের আনন্দঘন দিনটি/ আশা মনি
২০ বৈশাখি অনুষঙ্গ
২২ বাঙালির বৈশাখ/ সালাহ উদ্দিন আহমেদ মিন্টু
৩৯ বৈশাখি ফল
৪২ পৃথিবীর মডেল/ সাধন সরকার
৪৭ হামে শিশুর খাবার সচেতনতা
পুষ্টিবিদ লিনা আকতার
৪৯ আইসক্রিমের জন্মকথা/ সাঈদ বারী
৫১ বই হোক আমাদের বন্ধু/ মেজবাউল হক
৫৩ পাহাড়ে বর্ষবরণ/ জুবায়ের রানা
৫৫ নৌকা বাইচ/ রফিকুল ইসলাম বাবু
৬০ আমাদের সুন্দর পৃথিবী/ সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি


## গল্প


০৭ বৈশাখি মেলায়/ নুরুল ইসলাম বাবুল
১০ আনন্দের বেচাকেনা/ মো. সাইফুল ইসলাম
১৫ বোশেখ মেলায় তুবা/ শফিকুল আলম টিটন
২৫ কাকাতি কাকানি/ খোন্দকার মাহ্‌ফুজুল হক
৩৪ শিশিরের গ্রামে ফেরা/ তাপস কুমার দত্ত
৪০ মেঘপরির দেশে/ রেজাউল রেজওয়ান


## কমিক্‌স


৩২ বৈশাখি আনন্দ মেলা/ কাওছার মাহমুদ


## প্রতিবেদন


৫৭ জানালাবিহীন বিদ্যালয়/ রাইসা তাবাসসুম
৫৮ এশিয়ান গেমস হকিতে বাংলাদেশের মেয়েরা
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা


## কবিতাগুচ্ছ


০৪ হাসান হাফিজ/ মোশাররফ হোসেন খান
১৮ খোরশেদ আলম নয়ন/ পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী
১৯ মো. রহমত আলী রুহিত/ মো. মাহবুবুর রহমান
মো. আরিফুর রহমান
২৪ চৌধুরী আতাউর রহমান
৩৮ মো. জাকির হোসেন
৪৬ সুজিত হালদার/ মো. সোহরাব হোসেন
কবির মাহমুদ
৫২ রকিবুল ইসলাম
৬১ মুনছুর আহমেদ বিপ্লব


## ছোটোদের ছড়া


৩৮ আফসানা ইসলাম বৃষ্টি
৪৪ কাকলী আক্তার মৌ/ ইসরাত জাহান রোদেলা
মোছা. নাওয়ার আলম
৪৫ রিয়াজুল কবীর/ মো. সাব্বির হোসেন
মো. তাজুল ইসলাম (তপন)
৫৯ আয়ামান সিদ্দিকা


## আঁকা ছবি


দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : আরমান রহমান তাজিম
রামিসা মালিয়াত
তৃতীয় প্রচ্ছদ : সাফওয়ান আল আফিফ
শামরিন আনজুম তোয়া
শেষ প্রচ্ছদ : ফারদিনুল আসনান
৬২ মোহাম্মদ ইউসুফ তুর্য/ সামাইরা নূর
৬৩ তালবিয়া জিনাত রহমান তেহামি
মারিয়াম হোসেন (জিনুম)
৬৪ তাসনিম জাহান রাদিয়া/ মারিয়া হায়দার দিতু



নবারুণ পত্রিকা পড়া ও ডাউনলোড করা যাবে
Nobarun Potrika
www.dfp.gov.bd

মাটির ঘ্রাণ, কাঁচা আমের
স্বাদ আর বৈশাখি উৎসবে
আনন্দে মাতুক মন




১৪৩১

# বৈশাখ তুমি এলে

## হাসান হাফিজ

বৈশাখ বৈশাখ
পুরাতন ভেসে যাক
মধুভরা মৌচাক
তোড়জোড় হাঁক ডাক
হাসি রাশি ঝাঁক ঝাঁক।
ঐ এল এল রে
এসো এসো সব্বাই
সময় যে নাই নাই
সবে চোখ মেলো রে।
বচ্ছর পুরাতন
দ্যায় পিছু হন্টন
হারিয়ে সে গেল রে।

উল্লাস হৈ চৈ
মিলবে না কূল থৈ
খাবো মুড়ি মোয়া খৈ
মেলা শুরু তোরা কই?
ঝটপট চলে আয়
বৈশাখ পায় পায়
এসে গেছে এসেছে
স্বপ্নের অঙ্কুর
প্রাণরসে ভরপুর
খুশি-গাঙে ভেসেছে।

বৈশাখ বৈশাখ
ফলে ফুলে ভরা থাক,
আসে ঝড়-বৃষ্টি
নতুনের সৃষ্টি
বৈশাখ বৈশাখ
ভালো থেকো ঠিকঠাক
ব্যর্থতা মুছে যাক
ইচ্ছেরা ভাষা পাক।

# কাল বোশেখি ঝড়

## মোশাররফ হোসেন খান

ঈশান কোণে মেঘ জমেছে
ভীষণ ভয়ংকর
উঠল বুঝি ঝড়!

ঝড় উঠেছে ঝড় উঠেছে
ভাঙল নাকি ঘর?
বজ্রাঘাতে আকাশ-মাটি
কাঁপছে থরথর!

বোশেখ সে যে দস্যি ভারি
নেই তো বুকে ডর
হাওয়ার ডানায় দৈত্য দানো
করছে যেন ভর!

মেঘের সাথে বিজলি এসে
মিলছে পরস্পর
গগনতলে ভাঙন চলে
ধু-ধু তেপান্তর।

কাল বোশেখি ঝড়
এক পলকে নামিয়ে দেয়
মস্ত গাছের ধড়।

কাল বোশেখি ঝড়
ভীষণ ভয়ংকর...!




# বাঙালির আত্মিক শিকড় পহেলা বৈশাখ

## অ আ আবীর আকাশ

পহেলা বৈশাখ বাঙালির প্রাণের উৎসব। বাংলা বছরের প্রথম দিনটি কেবল একটি তারিখ নয়, এটি বাঙালির আত্মপরিচয়ের এক উজ্জ্বল প্রতীক। গ্রাম থেকে শহর, ধনী থেকে গরিব-সবাই একসঙ্গে মিশে যায় এই দিনে। আনন্দ, উৎসব, ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির এক অনন্য মিলনমেলা তৈরি হয় পহেলা বৈশাখকে ঘিরে।

বাংলা নববর্ষের সূচনা মূলত মুঘল আমলে সম্রাট আকবরের সময় থেকে। তখন কৃষকদের সুবিধার্থে ফসল তোলার মৌসুম অনুযায়ী বাংলা সনের প্রবর্তন করা হয়। সেই থেকেই বৈশাখ মাসের প্রথম দিনটি নতুন হিসাব-নিকাশের সূচনা হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এক সময় এই দিনটি ছিল মূলত কৃষক ও ব্যাবসায়ীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। জমির খাজনা পরিশোধ, হালখাতা এসব ছিল প্রধান আয়োজন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি পরিণত হয়েছে বাঙালির সার্বজনীন উৎসবে।

পহেলা বৈশাখ মানেই নতুন পোশাক, নতুন আশা আর নতুন স্বপ্ন। সকাল সকাল নতুন জামা পরে বের হওয়ার রীতিটি এখনও অনেক পরিবারে দেখা যায়। গ্রামের দিকে এই দিনের সকালটা একটু অন্যরকম। পাখির ডাক, হালকা রোদ আর চারপাশে উৎসবের আমেজ— সব মিলিয়ে এক অনন্য পরিবেশ তৈরি হয়। শহরে যেমন আনন্দ শোভাযাত্রা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, গ্রামে তেমন আয়োজন না থাকলেও সেখানে থাকে ছোঁয়া।

বৈশাখের অন্যতম আকর্ষণ হলো বৈশাখি মেলা। এই মেলা যেন গ্রামীণ জীবনের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। ছোটো ছোটো দোকান, মাটির খেলনা, বাঁশের তৈরি জিনিস, হাতে বানানো পাখা, চুড়ি, নানা ধরনের মিষ্টি-সব মিলিয়ে এক অন্যরকম জগৎ। শিশুরা মেলায় গিয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়। বড়োরাও ফিরে যায় শৈশবের স্মৃতিতে।

এক সময় বৈশাখি মেলায় গিয়ে 'গুলিয়া' বা ছোটো দা কিনে আনার এক বিশেষ আনন্দ ছিল। গ্রামের

ছেলেদের কাছে এটি ছিল গর্বের বিষয়। কেউ কেউ এই দা দিয়ে আম কেটে খেতো, আবার কেউ খেলনার মতো ব্যবহার করত। এই ছোটো ছোটো জিনিসগুলোই ছিল আমাদের আনন্দের উৎস। এখনকার শিশুদের কাছে হয়ত এসবের গুরুত্ব কমে গেছে, কিন্তু এক সময় এগুলোই ছিল জীবনের বড়ো সুখ।

মেলায় গেলে শুধু কেনাকাটাই নয়, ছিল নানা ধরনের খেলাধুলা ও বিনোদনের আয়োজন। নাগরদোলা, সার্কাস, বায়োস্কোপ, সাপের খেলা, পুতুল নাচ এসব ছিল মেলার প্রাণ। বায়োস্কোপে চোখ লাগিয়ে একের পর এক ছবি দেখা, কিংবা নাগরদোলায় চড়ে আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা- এসব স্মৃতি আজও অনেকের মনে গেঁথে আছে। গ্রামের মেলায় কখনো কখনো পালাগান, যাত্রাপালা বা লাঠিখেলার আয়োজনও হতো। যা ছিল গ্রামীণ সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পহেলা বৈশাখের খাবারও আমাদের সংস্কৃতির একটি বড়ো অংশ।



পান্তা-ইলিশ এখন শহুরে সংস্কৃতির একটি প্রতীক হয়ে উঠেছে, যদিও গ্রামে আগে থেকেই পান্তাভাতের প্রচলন ছিল। গরমের দিনে ঠান্ডা পান্তাভাত, সঙ্গে কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজ আর ভর্তা-এটাই ছিল সাধারণ মানুষের খাবার। এই সহজ খাবারই এখন উৎসবের অংশ হয়ে গেছে।

সময় বদলে গেছে ডিজিটাল যুগে, নাগরদোলা বা বায়োস্কোপের জায়গা নিয়েছে ডিজিটাল বিনোদন। তবুও পহেলা বৈশাখের গুরুত্ব একটুও কমেনি। এটি এখনও আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমরা কারা, আমাদের শিকড় কোথায়। আধুনিকতার ছোঁয়ায় অনেক কিছু বদলালেও আমাদের উচিত এই ঐতিহ্যগুলোকে ধরে রাখা।

গ্রামীণ বৈশাখের সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো হয়ত আর ফিরে আসবে না, কিন্তু আমরা চাইলে তার কিছুটা অন্তত ধরে রাখতে পারি। পরিবারের ছোটোদের মেলার গল্প বলা, ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলার সঙ্গে পরিচয় করানো, দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ তৈরি করা- এসবের মাধ্যমে আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি।

পহেলা বৈশাখ শুধু আনন্দের দিন নয়, এটি এক ধরনের আত্মশুদ্ধির দিনও। পুরনো বছরের সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে নতুনভাবে শুরু করার প্রেরণা দেয় এই দিনটি। তাই এই উৎসবকে শুধু বাহ্যিক আনন্দে সীমাবদ্ধ না রেখে এর ভেতরের অর্থটাও আমাদের উপলব্ধি করা উচিত।

সবশেষে বলা যায়, পহেলা বৈশাখ আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আর জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। বৈশাখি মেলার সেই গুলিয়া, নাগরদোলা কিংবা বায়োস্কোপ-এসব স্মৃতি আমাদের শেকড়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। সময় বদলাবে, মানুষ বদলাবে, কিন্তু আমাদের এই সংস্কৃতি যেন না হারিয়ে যায়- আমাদের সেই চেষ্টাই করা প্রয়োজন। ❑

---

সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও লোকসাহিত্য গবেষক

# বৈশাখি মেলায়

## নুরুল ইসলাম বাবুল

ছোটো মামা আমাকে কাছে ডেকে বললেন, রনি, চলো মেলায় যাই। আজ বিকেলে কাশিনাথপুর বটতলায় মেলা বসবে। বৈশাখি মেলা! আমি কখনো মেলায় যাইনি। ছোটো মামার কথায় মনটা আনন্দে নেচে উঠল। মায়ের কাছে বায়না ধরলাম– মা, আমি মেলায় যাব। আমার মামাতো-খালাতো ভাইবোনরাও যাবে। তাই মা রাজি হলেন। তখন দুপুরবেলা। মা সবাইকে ডেকে গোসল করতে বললেন। আমরা পুকুর ঘাটে হইচই করে গোসল করলাম। পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে বাবা সুন্দর একটা ফতুয়া কিনে দিয়েছেন। মা সেটা পরিয়ে দিলেন। আমার মামাতো-খালাতো ভাইবোনেরাও জামাকাপড় পরল। কিন্তু দুপুরটা যেন ফুরাতেই চাচ্ছে না। কখন যে বিকেল হবে আর আমরা ছোটো মামার সাথে বৈশাখি মেলায় যাব। ছোটো মামা খুব মজার মানুষ। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে তিনি নিজে গিয়ে আমাদের নিয়ে এসেছেন। অন্য খালাদেরও এনেছেন। আমার মামাতো-খালাতো ভাই-বোন সবাইকে নিয়ে হাসি-তামাশায় মেতে থাকেন ছোটো মামা। আমাকে তিনি সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

বিকেলে আমাদের নিয়ে ছোটো মামা মেলায় রওনা হলেন। বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে বড়ো মামা, মেজো মামা, সেজো মামা, সেজো খালা, ছোটো খালা সবাই কিছু কিছু করে টাকা দিলেন। নানা-নানিও দিলেন। মায়ের কাছ থেকেও পেলাম। আর ছোটো মামা তো সাথেই যাচ্ছেন। আমাদের মনটা খুশিতে টইটম্বুর।

মামাবাড়ি থেকে উত্তর দিকে কাশিনাথপুর বটতলা। মাঝখানে একটা ফাঁকা মাঠ। অল্প একটু রাস্তা। আমরা দলবেঁধে হাঁটতে লাগলাম। ছোটো মামা আগেআগে হাঁটছেন, কখনো পেছনে হাঁটছেন। কিন্তু আমার হাত ছাড়ছেন না। কিছুদূর যেতেই প্যাঁ-পুঁ বাঁশির আওয়াজ শুনলাম। শোনা গেল ঢোলের শব্দ।





আরও একটু যেতেই দেখা গেল চাকার মতো উঁচু কী যেন ঘুরছে। সেখান থেকে শোনা যাচ্ছে ক্যাঁচরক্যাঁচর শব্দ। মামা হাত দিয়ে সেটা দেখিয়ে বললেন, ওই দেখো, নাগরদোলা।

মেলার মধ্যে ঢোকার আগে ছোটো মামা সবাইকে সাবধান করে দিলেন। দলছুট হওয়া চলবে না। দলছুট হলেই হারিয়ে যাবে। তখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমি এই প্রথম মেলায় এলাম। আনন্দ লাগছে। আবার ভয়ও করছে। মেলায় ঢুকতেই চোখে পড়ল নানা রকমের দোকান- মুড়ি-মুড়কি, খেলনা, বেলুন, মাটির তৈরি বাসন-কোসন। বাঁশ-বেতের তৈরি ঝুড়ি। আরও কত কী! ভীড় ঠেলে ছোটো মামা নিয়ে গেলেন নাগরদোলার কাছে। মামার সাথে নাগরদোলায় উঠলাম। মামা সবাইকে বসিয়ে দিয়ে আমাকে কাছে বসালেন। এক হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরলেন। এই আমার প্রথম নাগরদোলায় ওঠা। ক্যাঁচরক্যাঁচর শব্দে নাগরদোলা চলতে শুরু করল। যখন উপরের দিকে উঠতে লাগল তখন মনে হলো আকাশের দেশে যাচ্ছি। কী মজা! কী মজা! আনন্দে হাততালি দিলাম। দলের অন্যরাও হাততালি দিলো। হঠাৎ দোলনা নিচের দিকে নামতে শুরু করল। সাথে সাথে বুকটা ধক করে উঠল। একটু পরেই আবার আকাশের দিকে উঠতে লাগলাম। দারুণ মজা হলো।

নাগরদোলা থেকে নেমে ছোটো মামা নিয়ে গেলেন মিষ্টির দোকানে। একটা বিশাল বটগাছের নিচে দোকানটা। বিরাট ছাউনি টাঙানো। চারপাশে বেঞ্চ পাতা আর মাঝখানে নানারকম মিষ্টি সাজিয়ে বসে আছে দোকানদার। ছোটো মামাকে দেখে দোকানদার হেসে ফেললেন। হয়ত আগে থেকেই পরিচয় আছে। দোকানদার হাসতে হাসতে বসতে বললেন। আমাদেরও আদর করে বসতে দিলেন। সবার হাতে মিষ্টি পৌঁছে গেল। আমাদের সাথে

গিয়েছিল রবিন। মামাদের বাড়ির পাশে ওদের ছোট্ট কুঁড়েঘর। নাগরদোলায় রবিন আমার সাথেই ছিল। আমার পাশে বসেই মিষ্টি খাচ্ছে। বৈশাখি মেলায় মিষ্টি খেতে খেতে বাড়ির কথা ভুলে গেলাম।

খাওয়া শেষে মামা বললেন, তোমরা কে কী কিনবে? বড়ো মামার ছেলে মাহি একটা বিরাট মাটির ঘোড়া কিনল। মেজো মামার মেয়ে মলি কিনল দুইটা টেপা পুতুল। মাটি দিয়ে টিপে টিপে এই পুতুল বানানো হয়। অন্যরাও পছন্দ মতো এটা-সেটা কিনল। আমি কিনলাম টমটম গাড়ি। সেইসাথে সবার হাতে হাতে নানা রঙের বেলুন। আমি কিনেছি দুইটা বেলুন। রবিনকেও একটা খেলনা কিনে দিলাম। রবিন খুব খুশি হলো। ওর আনন্দ দেখে আমার ভালো লাগল।

ছোটো মামা বললেন, সন্ধ্যা হওয়ার আগেই বাড়ি ফিরতে হবে। সেই মেঠোপথ ধরে আমরা হই-হুল্লোড় করতে করতে রওনা হলাম। রাস্তায় পা রেখেই টমটম গাড়ি টানতে শুরু করলাম। চমৎকার টুংটাং আওয়াজ। কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে প্যাঁ-পুঁ। দুষ্টু রাহি পা দিয়ে একগাদা ধুলি উড়িয়ে দিল। মামা ধমক দিলেন। পশ্চিমে থালার মতো লাল সূর্য। আমাদের হাতে হাতে রঙিন বেলুন। কী অপরূপ পড়ন্ত বিকেল!

বৈশাখি মেলা দেখে বাড়ি ফিরছি। সবার মনে আনন্দ। সবার মুখে হাসি। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল জাহান। সেজো মামার ছেলে জাহানের বেলুন ফুটে গেছে। অন্যরা হাততালি দিল। ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদতে লাগল জাহান। ওর কান্না দেখে আমার একটা বেলুন ওকে দিয়ে দিলাম। জাহান খুব খুশি হলো।

মামাবাড়ি ফিরে মাকে সব বললাম। রবিনকে খেলনা কিনে দেওয়ার কথা বললাম। জাহানকে বেলুন দেওয়ার কথা বললাম। মা শুনে খুব খুশি হলেন। বললেন, ভালো করেছ। সবাইকে সাথে নিয়ে আনন্দ করার মজাই আলাদা। ❑

---

সহকারী শিক্ষক, বিলচান্দক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফরিদপুর, পাবনা






# আনন্দের বেচাকেনা

## মো. সাইফুল ইসলাম

পহেলা বৈশাখ বাঙালির প্রাণের উৎসব। এই দিনে চারদিকে আনন্দ আর উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামের মাঠ থেকে শহরের রাস্তা- সব জায়গায় মানুষ নতুন বছরকে স্বাগত জানায়। ছোটো-বড়ো সবাই নতুন পোশাক পরে ঘুরতে বের হয়। মেলা, গান, নাগরদোলা, পান্তা-ইলিশ আর নানারকমের দোকানে জমে ওঠে বৈশাখের আনন্দ। এমনই এক পহেলা বৈশাখের দিনের গল্প বলছি।

সেদিন খুব সকালে আমার ঘুম ভাঙে। জানালার বাইরে পাখির ডাক শুনে মনে হলো দিনটি যেন অন্য দিনের চেয়ে একটু বেশি সুন্দর। মা সকালেই নতুন জামা বের করে রেখেছিলেন। লাল-সাদা রঙের পাঞ্জাবি পরে আমি আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। মা হাসতে হাসতে বললেন,

'আজ তো আমার ছেলেকে একদম বৈশাখের রাজপুত্র লাগছে!'

আমি খুশিতে হেসে উঠলাম। বাবা বললেন,

'আজ বিকেলে আমরা সবাই মেলায় যাব। তাই সকাল থেকেই তৈরি থেকো।'

এই কথা শুনে আমার আনন্দ আরো বেড়ে গেল। কারণ আমি সারা বছর অপেক্ষা করি বৈশাখের মেলার জন্য। সেখানে কত রকমের খেলনা, মিষ্টি আর আনন্দের আয়োজন থাকে!

সকালে আমরা সবাই মিলে পান্তাভাত, ইলিশ মাছ আর কাঁচা মরিচ দিয়ে খাওয়াদাওয়া করলাম। খেতে খেতে বাবা বৈশাখের ইতিহাস নিয়ে গল্প বলছিলেন। তিনি বললেন,

'এই উৎসব শুধু আনন্দের নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতিরও একটি অংশ।'

দুপুরের পর থেকেই আমি বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলাম। কখন বিকেল হবে আর আমরা মেলায় যাব! অবশেষে বিকেলে বাবা, মা, ছোটো বোন রিমি আর আমি একসাথে বের হলাম। রাস্তায় বের হয়েই দেখি চারদিকে মানুষের ভিড়। সবাই নতুন পোশাক পরে আনন্দে ঘুরছে। কারো হাতে বেলুন, কারো হাতে বাঁশি। রাস্তার পাশে বৈশাখি গান বাজছিল-

'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো'

গান শুনে মনটা আরো ভালো হয়ে গেল।

মেলায় পৌঁছাতেই দেখি বিশাল মাঠজুড়ে কত দোকান! কোথাও মাটির খেলনা, কোথাও কাঠের আসবাব, আবার কোথাও রঙিন চুড়ি আর মুখোশ বিক্রি হচ্ছে। ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা দৌড়াদৌড়ি করছে। মেলার প্রবেশপথে বড়ো করে লেখা ছিল- 'শুভ নববর্ষ'।

প্রথমে আমরা গেলাম খেলনার দোকানে। সেখানে কত রকমের খেলনা সাজানো ছিল! আমি একটি কাঠের বাঁশি পছন্দ করলাম। বাবা সেটি কিনে দিলেন। বাঁশিতে ফুঁ দিতেই মিষ্টি শব্দ বের হলো। রিমি একটি পুতুল কিনল। সে পুতুলটি হাতে নিয়ে এত খুশি হয়েছিল যে বার বার সবাইকে দেখাচ্ছিল।

এরপর আমরা নাগরদোলার দিকে গেলাম। বিশাল নাগরদোলাটি আকাশ ছুঁয়েছে যেন! প্রথমে একটু ভয় লাগছিল। কিন্তু বাবা সাহস দিলেন। আমি আর রিমি নাগরদোলায় উঠলাম। নাগরদোলা ঘুরতে শুরু করতেই মনে হলো আমরা যেন আকাশে উড়ছি। ওপর থেকে পুরো মেলাটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল। চারদিকে শুধু মানুষ আর রঙিন আলো।

নাগরদোলা থেকে নেমে আমরা খাবারের দোকানে গেলাম। সেখানে জিলাপি, বাতাসা, মুড়ি-মুড়কি, ফুচকা, চটপটি- কত কী! গরম গরম জিলাপির গন্ধে জিভে পানি চলে এল। মা আমাদের জন্য জিলাপি কিনলেন। আমি এত মজা করে জিলাপি খেলাম যে আরেক প্লেট খেতে ইচ্ছে করছিল।

মেলার এক পাশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। কয়েকজন ছেলে-মেয়ে বৈশাখি গান গাইছিল। একজন বাঁশি বাজাচ্ছিল খুব সুন্দর করে। আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান দেখলাম। মানুষের হাততালি আর হাসির শব্দে পুরো পরিবেশ আনন্দে ভরে উঠেছিল।

হঠাৎ দেখি একজন বৃদ্ধ লোক মাটির তৈরি জিনিস বিক্রি করছেন। তার দোকানে সুন্দর সুন্দর ফুলদানি, কলস আর পুতুল সাজানো ছিল। কিন্তু অন্য দোকানের মতো সেখানে ভিড় ছিল না। আমি বাবাকে বললাম, 'চলো না, ওনার কাছ থেকে কিছু কিনি।'

বাবা হাসলেন। তিনি একটি ছোটো ফুলদানি কিনলেন। বৃদ্ধ লোকটির মুখে তখন আনন্দের হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন,

'বাবা, তোমরা ভালো থেকো।'

তার কথা শুনে আমার খুব ভালো লাগল। বুঝতে পারলাম, ছোটো একটি সাহায্যও কাউকে অনেক খুশি দিতে পারে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। মেলার চারদিকে রঙিন বাতি জ্বলে উঠল। তখন মেলাটা যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠল। আমরা কিছু ছবি তুললাম। রিমি বেলুন হাতে নাচছিল। বাবা-মাও খুব আনন্দ করছিলেন।

ঠিক তখনই একটি ছোটো ছেলে কাঁদতে কাঁদতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। সে তার মাকে খুঁজে পাচ্ছিল না। ছেলেটিকে দেখে আমার খারাপ লাগল। বাবা তাকে শান্ত করে মেলার মাইকে খবর দিতে

নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তার মা দৌড়ে এসে ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন। মা-ছেলের সেই মিলন দেখে সবার চোখে আনন্দ ফুটে উঠল।

রাত হয়ে গেলে আমরা বাড়ির পথে রওনা দিলাম। ফেরার সময় আমার হাতে বাঁশি, রিমির হাতে পুতুল আর সবার মুখে ছিল হাসি। বাড়ি ফিরে আমি সারাদিনের কথা ভাবতে লাগলাম। মনে হচ্ছিল, দিনটি যেন খুব দ্রুত শেষ হয়ে গেল।

সেদিনের বৈশাখি মেলা আমাকে শুধু আনন্দই দেয়নি, অনেক কিছু শিখিয়েছিল। আমি শিখেছিলাম আমাদের সংস্কৃতিকে ভালোবাসতে, সবাইকে সাহায্য করতে এবং পরিবারের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিতে। পহেলা বৈশাখের সেই দিনটি আজও আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর স্মৃতিগুলোর একটি হয়ে আছে। ❑

---

পরিদর্শক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নোয়াখালী





# নববর্ষের আনন্দঘন দিনটি

## আশা মনি

পুরনো দীনতা ও জীর্ণতা দূর করে নতুন বছর আসে একরাশ ফুলেল শুভেচ্ছা ও সুখ নিয়ে। আর এই ফুলের সুবাস ছড়ায় খাঁটি বাঙালি ও বন্ধুদের আমেজে। টিটু, ছোটন, তামিম, বাবলু, শান্তা, মিফতা ও টিনা সবাই খুব ভালো বন্ধু। সবাই মিলে প্ল্যান করেছে এবারের নববর্ষ বিদ্যালয়েই জাঁকজমকভাবে উদযাপন করবে। চৈত্রের শেষ দিন বৈশাখকে বরণ করার জন্য বিদ্যালয়কে বর্ণিল সাজে সজ্জিত করে।

সকাল হতেই প্রকৃতি নতুন রূপে নিজেদের সবুজ আবরণে সাজিয়ে তোলে। গাছের পাতায় পাতায় শুরু হয় নতুন জীবনের ছোঁয়া। সেই আনন্দে বন্ধুরা সবাই প্রস্তুতি নেয় নববর্ষ উদযাপনের। আনন্দ শোভাযাত্রায় মুখরিত হয় বৈশাখি মেলা। ছেলেরা পড়ে পাঞ্জাবি। আর মেয়েরা পড়ে লাল পেড়ে সাদা শাড়ি। বাঙালি জাতির অস্তিত্ব যেন এরই মধ্যে বেঁচে আছে।

মেলায় চড়কি, নাগরদোলা, পালকি ছাড়াও ইলিশ-পান্তা, মিষ্টির দোকান বসে। রাস্তার দু'ধারে ছোটো ছোটো দোকানে কুমোররা নিয়ে আসে নকশা করা রঙিন হাঁড়ি, পুতুল ইত্যাদি। প্রথমেই বন্ধুরা সবাই মিলে উঠল নাগরদোলায়। কিন্তু নাগরদোলায় উঠেই শান্তা ভয়ে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে, আমাকে

নামিয়ে দাও আমি আর জীবনেও নাগরদোলায় উঠব না। আর এটা দেখে বাবলু ও তামিম হাসতে থাকে। ওদিকে টিটু নাগরদোলা থেকে নেমেই সোজা চলে যায় মিষ্টির দোকানে আর মজার মজার মিষ্টি খেয়ে তার পেট ভরে যায়। এদিকে বিদ্যালয়ের মাঠে শুরু হয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা। মোরগ লড়াই, কুস্তি, হাডুডু, বিস্কুট দৌড় প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। সবাই যার যার পছন্দমতো খেলায় অংশগ্রহণ করে। তারপর চলে যায় ইলিশ-পান্তা খাওয়ার জন্য। সবাই মিলে হাসি আর আনন্দ করতে করতেই বিকেল হয়ে এল। শুরু হলো উন্মুক্ত মঞ্চে বাউলগান, কবিগান, লোকগীতি ও বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই আসরে ছাত্রছাত্রীরা ছাড়াও স্থানীয় লোকশিল্পীরা অংশ নেয়। অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে অনুষ্ঠানটি পরিচালনার পর শুরু হয় পুরস্কার বিতরণী। দেখতে দেখতেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ের মাঠ শূন্য হতে থাকে। টিটু, ছোটন, তামিম, বাবলু, শান্তা, মিফতা







সবাই মিলে যার যার পছন্দমতো শখের জিনিস কিনে। বাড়ি ফেরার পথে সবাই নকশা করা শখের হাঁড়িতে করে জিলাপি এবং মুড়ি-মুড়কি নিয়ে যায়।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে। আর মুখে মুখে ছড়া কাটে-

বৈশাখ আসে নতুন রূপে
এই ধরা'টা সাজে,
বৈশাখ আসে খুশি নিয়ে
তাই তো ঢাকঢোল বাজে।

ইলিশ-পান্তার ভোজন বিলাস
হরেক রকম খেলা,
নানান রকম আনন্দেতে
কাটল সুখের বেলা।

এ দিনটি এতই আনন্দঘন ছিল যে, সবার মাঝে এর রেশ থাকে অনেকদিন ❑

---

শিক্ষার্থী, সরকারি করিম উদ্দিন পাবলিক কলেজ, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট



# বোশেখ মেলায় তুবা

## শফিকুল আলম টিটন

সারারাত ঘুম হয়নি তুবার। দুই চোখে নেই ছিটেফোঁটা ঘুমের প্রলেপ। স্বপ্ন আর ভাবনাগুলো বারবার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে ওকে।

এই প্রথম বৈশাখি মেলায় যাবে তুবা। মায়ের মুখে শুনেছে উদ্যানের ভেতর নাকি পান্তা-ইলিশের সারি সারি দোকান ঘর ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে একজন মচুয়া লোক মাটির খোরায় পান্তাভাত আর এক টুকরো ইলিশ দিয়ে প্লেট সাজাচ্ছে। লবণ, মরিচ, পিঁয়াজ, তার সাথে আলুভর্তা আর ঝাল শুঁটকি ভর্তা। এই হলো বৈশাখি পান্তা-ইলিশ প্লেট। প্লেট প্রতি মূল্য ধরা হয়েছে পাঁচশত টাকা। লোকটির পাশে উনুন ধরানো আছে। তাতে বড়ো একটা হাঁড়িতে ভাত রাঁধা হচ্ছে। গরম গরম। রান্না হয়ে গেলে বড়ো একটা ডেকচিতে ভাত ঢেলে তাতে পানি দিয়ে পরিপূর্ণ করা হচ্ছে। এটাকে বলে বোশেখের গরম গরম পান্তা-ইলিশ।

সারারাত ঘুমায়নি তুবা। ঠিক ধলপহরের সময় দুই চোখে নেমে আসে রাজ্যের ঘুম। ক্লান্তি নেমে আসে শরীর জুড়ে। কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে টেরই পায়নি ও।

ভিড় ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে মায়ের হাত ধরে। পেছন পেছন বাবাও এগিয়ে আসছে। মা বার বার সাবধান করে দিচ্ছে তুবাকে।

মা দেখে দেখে পা ফেলো। পড়ে গেলে চোট পাবা।

আচ্ছা মা। সায় দেয় তুবা। এত্ত ভিড় কখনোই দেখেনি ও। এই প্রথম এল মেলায়। সবার গায়ে

বৈশাখি পাঞ্জাবি আর মেয়েরা বৈশাখি শাড়ি পড়ে এসেছে। সবার চোখে-মুখে যেন আনন্দের ছাপ। বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, ব্যথা-বেদনা নেই। ফুটপাতের চারপাশ ধরে হকাররা বাঁশি বাজিয়ে চলেছে। নানারকম খেলনা কাঁধে নিয়ে বিক্রি করছে। বেলুনওয়ালা বেলুন ফুলিয়ে সুতোয় বেঁধে শূন্যে উড়িয়ে ঘুরছে। রাস্তার একপাশে ফুটের ওপর কয়েকটি চায়ের দোকান সাজিয়ে বসেছে। অনেকগুলো লোক চা খেতে খেতে গল্প জুড়িয়ে দিয়েছে। আহা কি আনন্দ ! দেখে মনে হয় এটাই ওদের বাসাবাড়ি! আনন্দে আত্মহারা হয়ে মনের সুখে মনের ভাব প্রকাশ করছে। খুব ভালো লাগল তুবার। মায়ের হাত ধরে আরো এগিয়ে গেল তুবা। বাংলা নববর্ষকে নতুনভাবে বরণ করে নেওয়ার জন্য। কিছু দূর যেতেই তুবার খুব পানির পিপাসা লাগল।

মা, পানি খাবো ! মাকে বলে তুবা।

দাঁড়া মা। আরেকটু সামনে যাই। ওখানে দোকান থেকে পানির বোতল নিয়ে নেবো।

আচ্ছা মা। তুবা সায় দেয়। আর কতদূর গেলে পান্তা-ইলিশ খেতে পারব মা?

পানি খেয়ে আর কিছুক্ষণ হেঁটে গেলেই পাবো বিশাল একটা উদ্যানের গেট। ভেতরে ঢুকে গেলেই দেখবে সারি সারি দোকান ! বাউল শিল্পীরা বটমূলে বাংলার গান গাইছে। ঘুরতে আসা সবাই সেই গান শুনছে। কেউ পান্তা-ইলিশ খেতে ব্যস্ত। কেউ লেকের ভেতর নেমে নৌকা চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সত্যিই তো মা ? তুবা বলল মায়ের উদ্দেশে। আমার পাঠ্যবইতেও তো তাই লেখা আছে। এই দৃশ্য আজ নিজ চোখে দেখব। সত্যিই আনন্দের ! তাই না মা ?



হুম! চলো দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। বাবা ততক্ষণে দোকান থেকে এক বোতল মিনারেল ওয়াটার কিনে নেয়। বোতলের ছিপি খুলে এগিয়ে দেয় তুবার দিকে। অনেক পিপাসায় কাতর তুবা ঢক ঢক করে পানি পান করে। সেই সাথে মা তার গলাটাকেও ভিজিয়ে নেন। আবার পথ চলা শুরু।

মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর উদ্যানের সামনে এসে দাঁড়ায় ওরা। শত শত লোক সারিবদ্ধভাবে ভেতরে ঢুকছে। মা এবার তুবার হাতটা একটু শক্ত করে ধরল। বাবাও মাকে আর তুবাকে হাত দিয়ে নিরাপদে রেখে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। ভেতরে ঢোকার পর তুবার দুই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল !

এত্ত মানুষ ! সবাই সাজুগুজু করে এসেছে ! তুবার গায়ে বৈশাখি জামা। সাথে ছোট্ট এক টুকরো ওড়না। কাঁধের এক পাশ থেকে আরেক পাশে ঝুলে নেমে এসেছে ছোট্ট ভ্যানিটি ব্যাগ।

ধীরে ধীরে একটু সামনে এগিয়ে পান্তা-ইলিশের দোকানে এসে দাঁড়ায়।

একটা ছেলে এগিয়ে এসে স্বাগত জানায়।

আসেন স্যার। আমাদের পান্তা-ইলিশ খেয়ে যান। স্বাদে অতুলনীয়। মুখে লেগে থাকবে বহুদিন।

বাবা মুচকি হেসে তুবা আর মাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। ততক্ষণে ছেলেটি হাত ধোয়ার জন্যে একটা পাত্র আর পানি নিয়ে এসে পাশে দাঁড়ায়। একে একে সবার হাত ধোয়া হয়ে গেলে ছেলেটি টিস্যু পেপার এগিয়ে দেয়। বাবা হাত মুছতে মুছতে অর্ডার করলেন তিন প্লেট পান্তা ইলিশের।

মিনিট বিশেক পর সামনে হাজির হলো বাঙালির ঐতিহ্য পান্তা-ইলিশ। সাথে কয়েক পদের ভর্তা। বাবা ভাতটাকে একটু ছুঁয়েই হেসে উঠলেন।

খোকা তোমাদের পান্তা-ইলিশ গরম কেন। এটা তো ঠান্ডা হওয়ার কথা।

ছেলেটি খিলখিল করে হেসে ওঠে। চোখে পড়ল ছেলেটির সামনের পাটির দুটো দাঁত নেই। ফোকলা দাঁতের হাসিতেই বাবা কাবু হয়ে গেলেন।

ওহ আচ্ছা। বলতে বলতে বাবা তুবার দিকে তাকায়।

মা। এটা তোমার পান্তা-ইলিশ। খেতে শুরু করো। ভর্তা একটু মুখে দিয়ে দেখো। ঝাল বেশি লাগলে খেয়ো না।

আচ্ছা বাবা। বলেই খেতে শুরু করল তুবা।

চারপাশে বাদ্য-বাজনার প্যা-পু বাঁশিতে পরিবেশ অস্থির হয়ে উঠেছে। তবু খারাপ লাগছে না।

পান্তা-ইলিশের পর্ব সেরে উঠে পড়ল ওরা। বিল চুকিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল বটমূলের দিকে। বাউল শিল্পীরা একে একে গান গাইছে সমবেত কণ্ঠে। গান শুনতে শুনতেই হঠাৎ কে যেন হাত ধরে টানতে লাগল তুবার। প্রথমে ভয় পেয়ে যায় ও।

চোখ মেলে তাকায় তুবা। দেখে মা ডাকছে ওর হাত ধরে। মাকে দেখে আদুরে কণ্ঠে বলে, মা আমরা কোথায় ?

কেন বাসায় ?

মা আমরা তো পান্তা-ইলিশ খেয়ে বাউল শিল্পীদের গান শুনছিলাম। ওদেরকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? ওরা কোথায়?

আমরা তো বাসায় মা। তুমি বটমূলে বৈশাখি মেলায় যাবে আজ আমাদের সাথে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো মা।

বৈশাখি মেলার কথা শুনে মাকে বলে, কেন মা ? তুমি আমি আর বাবা তো বৈশাখি মেলায় ছিলাম। বাসায় এলাম কী করে?

মা একগাল হেসে বলে, তুমি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলে। চলো মা, চটজলদি উঠে পড়ো। মেলায় যাব।

মেলায় যাবার কথা শুনে তুবা হাসতে হাসতে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। ❑

---

শিশুসাহিত্যিক ও ছড়াকার

কবিতায় বৈশাখ

## প্রিয় বৈশাখ

### খোরশেদ আলম নয়ন

শুকনো পাতায় ছাওয়া —আমাদের ঘর
এই গড়ে —এই ভাঙে —বৈশাখি ঝড়;
মেঘনার কালো জল-ঢেউ ওঠে কূলে
ঘাটে বাঁধা ডিঙা নাও -কেঁপে ওঠে দুলে।

আমের বনের ছায়ে -জাগে কোলাহল
হঠাৎ বৃষ্টি এসে -একহাঁটু জল,
বৈশাখে ছিল ঝড়-বোশেখ মেলা
ছিল আরো দুরন্ত -কিশোর বেলা ;

দিদির আঁচলে ঘেরা -নিবিড় মায়া
ছিল মেঘনার তীর -বটের ছায়া,
ভাটির দেশের নাও-মাটির পুতুল
বারোয়ারি মেলা জুড়ে -কাগজের ফুল;

হাতের রঙিন চুড়ি-পায়ের নূপুর
'বউ কথা কও ডাকা'- উদাস দুপুর
বোশেখ দিনের সেই -স্বপ্নমধুর
মেলায় কেনা বাঁশি —খুঁজে আজো সুর!

নাগর দোলায় দোলা —স্বপ্নিল দিন
ছিল চিরমধুময়-স্মৃতি অমলিন;
সবুজ প্রান্ত ছুঁয়ে —যত দূর যাই
শ্যামল এ বাংলার —রূপ খুঁজে পাই!

পুরাতন গ্লানি মুছে -নতুনের ডাক
নিয়ে আসে বার বার —প্রিয় বৈশাখ!

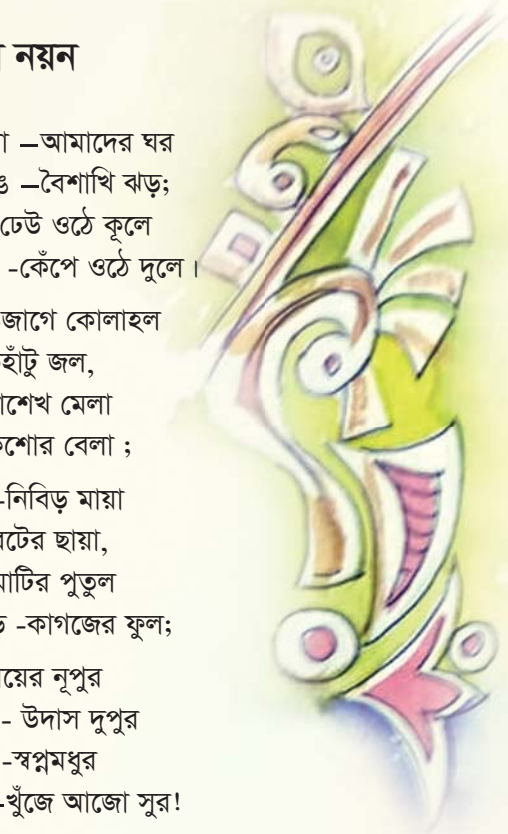

## পয়লা বোশেখ

### পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী

ভালো লাগে যেদিন তুমি
আসো আমার দেশে
বছরের ওই একটা দিনই
সময় কাটে হেসে।

প্রতিদিনই হয় না কেন
ওই দিনেরই মতো?
তাহলে তো বছর জুড়েই
কত্ত মজা হতো।

থাকত না আর ব্যথা-বেদন,
দৈন্যতা, কায়-ক্লেশ
সাম্য, মৈত্রী, ও ভালোবাসায়
ভেসে যেত দেশ।

মন থেকে ওই ময়লা-ধুলো
মুছে যেত সব
স্বদেশ জুড়ে উঠত
সম্প্রীতিরই রব।



## গাছের ছায়া

### মো. রহমত আলী রুহিত

বটগাছ দাঁড়িয়ে আছে
প্রান্তরের মাঝখানে
শীতল ছায়ায় প্রশান্তি দেয়
ক্লান্ত পথিকের প্রাণে।

গ্রীষ্মের রোদে
ছায়া দেয় সবারে
শিশুরা খেলে
গাছতলায় দুপুরে।

ফল দেয়, ফুল দেয়,
দেয় নির্মল বায়ু
গাছ ছাড়া পৃথিবী
হতো না কভু।




## বৈশাখের আহ্বান

### মো. মাহবুবুর রহমান

কোকিল ডাকে বনে
হাসে কদম ফুল
বৈশাখ এলে জেগে ওঠে
নদীর দুই কূল।

পুরেনো সব দুঃখগুলো
করি আজ শেষ
নতুন আশায় শুরু করি
নতুন বাংলাদেশ।

বাংলার ঐতিহ্য
প্রাণে বাজে ঢাক
সুখে কাটুক সবার
প্রতিটি বৈশাখ।

## প্রকৃতির রূপ

### মো. আরিফুর রহমান

আম, কাঁঠাল, লিচু ভরা
বাংলার বাগান
প্রকৃতির এই রূপে
জুড়ায় সবার প্রাণ।

পদ্মফুল ফুটে থাকে
গ্রামের শান্ত পুকুরে
জোনাক জ্বলে সন্ধ্যা হলে
অন্ধকারের আড়ালে।

ধানের শিষে সোনার রং
বাতাসে দোল খায়
বাংলার সৌন্দর্যের কথা
আছে কবিদের বর্ণনায়।



# বৈশাখি অনুষঙ্গ
























# বাঙালির বৈশাখ

সালাহ উদ্দিন আহমেদ মিন্টু

বাঙালি জীবনের অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন একটি উৎসব হলো পহেলা বৈশাখ। ব্যস্ত নগর কিংবা গ্রামীণ জীবন যেটাই বলা হোক না কেন এই নববর্ষই বাঙালি জাতিকে একত্র করে জাতীয়তাবোধে। এই অনুষ্ঠান পরিণত হয় প্রত্যেকটি বাঙালির মিলনমেলায়। ধর্ম, বর্ণ সব পরিচয়ের ঊর্ধ্বে বাঙালি জাতি এ নববর্ষকে সাদরে আমন্ত্রণ জানায়। বছরের প্রথম দিনটি শুধু বাঙালির নয়, বাংলা ভাষাভাষী আদিবাসী এবং ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকটি মানুষের জীবন -জগতে স্বপ্নময় নতুন বছরের শুভ সূচনা ঘটায়।

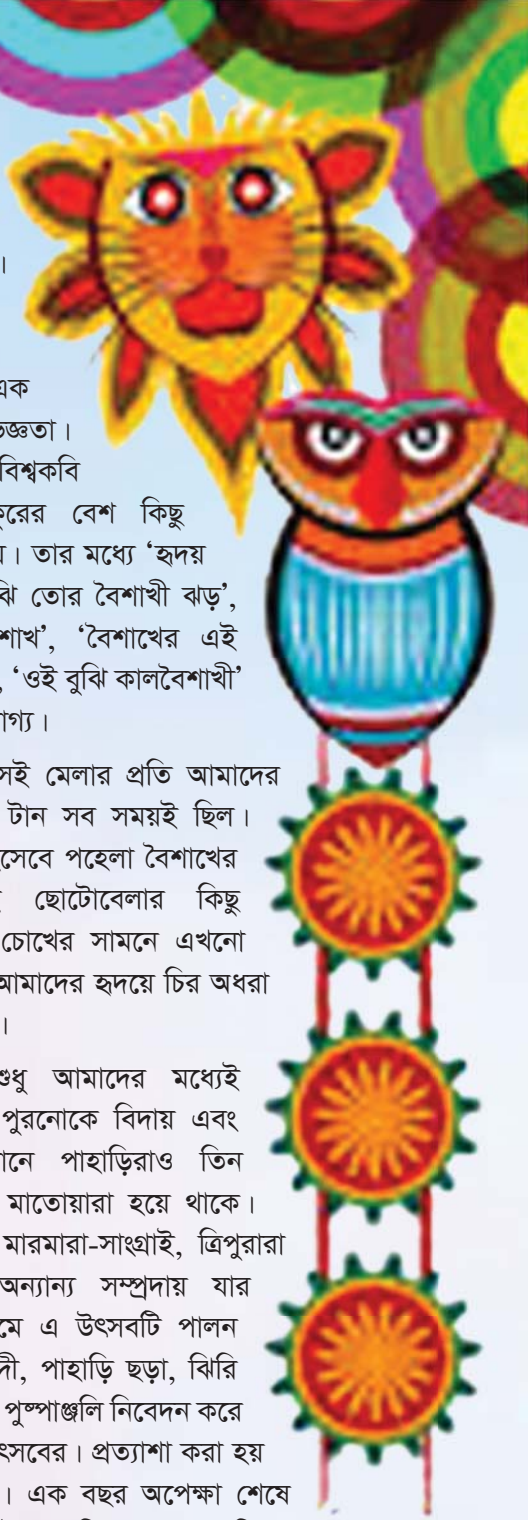

‘বৈশাখ’ শব্দটি এসেছে বিশাখা নামক নক্ষত্রের নাম থেকে। এই মাসে বিশাখা নক্ষত্রটিকে সূর্যের কাছে দেখা যায় বলে বিশাখা থেকে বৈশাখ। গ্রেগরীয় পঞ্জিকায় দেখা যায়, ইংরেজি এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে এ সৌরবছর গণনা শুরু হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য শুরুর পর থেকে আরবি বছর হিজরি পঞ্জিকা অনুযায়ী তারা কৃষি পণ্যের খাজনা আদায় করত। কিন্তু হিজরি সাল চাঁদের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় কৃষি ফলনের সঙ্গে এর কোনো মিল পাওয়া যেত না। আর তখনই সম্রাট আকবর সুষ্ঠু সমাধানের জন্য বাংলায় বর্ষপঞ্জি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৫৮৪ সালে পহেলা বৈশাখ চালু হলেও তা সম্রাট আকবরের সিংহাসন আরোহণের বছর অর্থাৎ ১৫৫৬ সাল থেকে তা গণ্য করা হয়।

বৈশাখ মানে নবজাগরণ, বৈশাখ মানে আম-কাঁঠালের ঘ্রাণ, বৈশাখ মানে কৃষকের চাওয়াপাওয়া, বৈশাখ মানে গাছতলার মেলা, বৈশাখ মানে মেঘ-রোদের খেলা, বৈশাখ মানে কালবৈশাখি। সর্বোপরি বৈশাখ উৎসবের সৌন্দর্য-সরলতা আর স্বতঃস্ফূর্ততায় মানুষের অংশগ্রহণে। কোনো বড়ো বাজেট বা আয়োজন ছাড়াই এ বৈশাখ আমাদেরকে একত্র করে, সম্পর্কের দৃঢ়তা তৈরি করে আর জীবনের প্রতি ভালোবাসা বাড়ায়। আজকের মতো আলোকসজ্জা প্রযুক্তি নির্ভর জাকজমক না থাকলেও সেই সময়ের উৎসবগুলো ছিল গভীরতর আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ।

বৈশাখ আমার কাছে শুধু বর্ষপঞ্জির একটি তারিখ নয় বরং শৈশবের এক অব্যক্ত অনুভূতির নাম। তখনকার আনন্দগুলো লুকিয়ে ছিল খুব ছোটো ছোটো জিনিসে। বৈশাখি মেলা ছিল বছরের সবচেয়ে প্রতীক্ষিত আয়োজন। দাদা-বাবার হাত ধরে মেলায় যাওয়া, ঘুরে বেড়ানো, চারপাশের রঙিন পতাকা, ধুলোমাখা মাঠ, মাইকিং আর ঢোলের শব্দ সব কিছুতেই এক মুগ্ধতা কাজ করত। বাঁশ-বেতের সামগ্রী, আমিত্তি (জিলাপি), মুরালিসহ হরেক রকম খাবার ও নানারকম বাঁশি আর বাজনার মাঝে যে সরল আনন্দ ছিল আজকের ডিজিটাল যুগে তা মেলা ভার। নাগরদোলা ছিল সাহস ও আনন্দের এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। বৈশাখ নিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেশ কিছু গান পাওয়া যায়। তার মধ্যে ‘হৃদয় আমার’ ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড়’, ‘এসো হে বৈশাখ’, ‘বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া’, ‘ওই বুঝি কালবৈশাখী’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ছোটোবেলার সেই মেলার প্রতি আমাদের আলাদা একটা টান সব সময়ই ছিল। কিন্তু বাঙালি হিসেবে পহেলা বৈশাখের কথা ভাবলেই ছোটোবেলার কিছু অমলিন স্মৃতি চোখের সামনে এখনো ভেসে উঠে যা আমাদের হৃদয়ে চির অধরা রঙে রয়ে গেছে।

এই উৎসব শুধু আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পুরনোকে বিদায় এবং নতুনকে আহ্বানে পাহাড়িরাও তিন দিনের উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে থাকে। চাকমারা-বিজু, মারমারা-সাংগ্রাই, ত্রিপুরারা বৈসুক এবং অন্যান্য সম্প্রদায় যার যার ভাষার নামে এ উৎসবটি পালন করে থাকে। নদী, পাহাড়ি ছড়া, ঝিরি ঝরনার পানিতে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে সূচিত হয় এ উৎসবের। প্রত্যাশা করা হয় সুখ ও সমৃদ্ধির। এক বছর অপেক্ষা শেষে পাহাড়িদের এ উৎসব মিলনমেলায় পরিণত হয়। খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙামাটির ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বিভিন্ন বয়সি মানুষ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আর আনন্দের মধ্যে দিয়ে নতুন বছর তথা বৈশাখকে

বরণ করে নেয়। বৈদিক পঞ্জিকায় এই মাসকে মাধব মাস এবং বৈষ্ণব পঞ্জিকায় একে মধুসূদন মাস বলা হয়ে থাকে।

বৈশাখের কাঠফাটা রোদ আর তপ্ত নিশ্বাসের মাঝেও প্রকৃতি নিজেকে সাজাতে ভোলেনি। বৈশাখের খরতাপ প্রকৃতিতে প্রাণের স্পন্দন হয়ে ফুটে উঠে নয়নাভিরাম 'জারুল' ফুল। বেগুনি রঙের এই ফুলের মায়াবী রূপ দেখে মনে হয় যেন কোনো নিপুণ শিল্পী পরম মমতায় প্রকৃতিকে রাঙিয়ে দিয়েছেন তার তুলিতে।

বৈশাখ মানেই যে আনন্দ তা নয়। বৈশাখের গরম পরিবেশে শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়। ফলে শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত বেড়ে গিয়ে মাথা ব্যথা, দুর্বলতা, বমি বমি ভাব, খিঁচুনি ধরা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার প্রবণতা খুব বেশি দেখা যায়। কাজেই পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা ব্যক্তিগত সুরক্ষায় অনেক ক্ষেত্রে ওই সমস্ত রোগের সহজ প্রতিকার পাওয়া যায়। এ মাসেই কালবৈশাখির ঝড়ে জলোচ্ছ্বাস, প্রাণহানীসহ ঘরবাড়ি, ফসলাদির অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে।

বাংলা বর্ষপঞ্জির প্রতিটি মাসই যেন একেকটি গল্পের ভাণ্ডার। বৈশাখ মানেই প্রাণস্ফুরণের এক বিশাল ডালি। বাংলা সংস্কৃতির গভীরে তাকালে দেখা যায়, এ উৎসব শুধু আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয় বরং একটি জীবন্ত চেতনা যা আমাদের জীবনযাপন, চিন্তা, অনুভূতি এবং সামাজিক বন্ধনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমরা বছরে একবার পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন করি খুব আনন্দ-উল্লাসে। কিন্তু এই উদ্‌যাপনের যথার্থতা যদি সারা বছর জুড়ে আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হয় তাহলে আমাদের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি আরও গভীর ও বিস্তৃত হবে। ❑

---

সেকশন অফিসার (অব.), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা

# ছয় ঋতুর দেশ

## চৌধুরী আতাউর রহমান

বাংলাদেশ ছয় ঋতুর রঙিন এক দেশ,
প্রতিটি ঋতু নিয়ে আসে নতুন সুখের রেশ।
গ্রীষ্ম আসে ফলের মিষ্টি ঘ্রাণ নিয়ে,
বর্ষা নামে সতেজ বৃষ্টি ভেজা গান গেয়ে।
শরতের আকাশ সাদা মেঘে হাসে,
কাশফুল দোলে নদীর ধারে উদাসী বাতাসে।
হেমন্ত আনে রাশি রাশি সোনালি ধান
আনন্দে ভরে যায় কৃষকের মন–প্রাণ।

শীতের সকালে কুয়াশা নামে ধীরে,
খেজুর রসে মিষ্টি মুখ
সুখের ছোঁয়া নীড়ে।
বসন্ত ফুলে ফুলে ভরে বাগ–বাগিচা বন,
কোকিল ডাকে মিষ্টি মাখা স্বরে মায়া ভরা গান
ছয় ঋতুর দেশ আমার প্রিয় বাংলাদেশ
সুখের পরশ শান্ত দোলা
মন ভোলানো স্বদেশ।





# কাকাতি কাকানি

খোন্দকার মাহ্‌ফুজুল হক

ক্বা! ক্বা! ক্বা! ক্বা-আ! ক্বা-আ!

শব্দটা সুব্‌হার কানে ঝন ঝন করছে। শব্দ থেকে বাঁচার জন্য সে কানে বালিশ চাপা দিলো। কিন্তু এরপরও শব্দটা আসছে। এক সময় সহ্য করতে না পেরে সে উঠে বসল। জানালা দিয়ে কাকটাকে দেখা যাচ্ছে। একটা ডালে বসে আছে।

সুব্‌হা মনে মনে বলে উঠল; কী আশ্চর্য! বিরক্তিকর। কাকটা তাড়ানো ছাড়া উপায় দেখছি না। কীভাবে তাড়ানো যায় তাও তো বুঝতে পারছি না।

ক্বা! ক্বা! ক্বা!

কাকটা আবারও ডেকে উঠল। সুব্হা মুখ দিয়ে হুইশ হুইশ শব্দ করল। কাকটা এতে কিছুটা চমকে উঠল। ঘাড় বাঁকা করে সুব্হার দিকে তাকালো। সুব্হা কাকের লাল-কালো চোখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

যাহ্! হুইশ! যাহ্! সুব্হা বলল।

কেন যাব? যাব না।

সুব্হা চমকে উঠল। কে কথা বলছে। রুমের ভেতর তাকালো । কেউ নেই। অথচ সে স্পষ্ট শুনেছে।

ফাল্গুন মাসের দুপুর। ঠান্ডা-গরম দুটোই সমান সমান। দুপুরে খাওয়া শেষে সুব্হা বিছানায় এসেছে। ঘুম ঘুম একটা ভাব মাত্র এসেছে তার চোখে। তখনই কাকটা ডেকে উঠল।

ক্বা-আ! ক্বা-আ! ক্বা-আ! কাকটা আবার ডাকছে।

আহ্হারে যন্ত্রণা! এই যাহ্! যাহ্! সুব্হা বলে উঠল।

না, যাবো না। আমার এখন কাজ আছে।

সুব্হা আবার চমকে উঠল। সে এবার আরো স্পষ্ট শুনেছে। কথাগুলো রুমের মধ্যে কেউ বলছে না। কথাগুলো আসছে বাইরে থেকে।

সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। সুব্হাদের বাসা তৃতীয় তলায়। তাদের জানালার পাশে পুকুর। পুকুর পাড়ে আমগাছ। সে গাছে শুধু একটা কাক বসে আছে। আশপাশে কোনো মানুষজন নেই। তারপরও শিওর হওয়ার জন্য সুব্হা জানালা দিয়ে মুখ বের করে বলল- কে কথা বলছেন?

আমি।

আমি কে? আপনাকে তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।

নিচের দিকে তাকালে দেখবে কী করে! আমি তো উপরে। আমগাছে।

সুব্হা এবার মাথা সোজা করল। আমগাছের দিকে তাকালো।

এই তো, এবার দেখতে পেয়েছ আমাকে।

সুব্হা চোখ পিটপিট করে কাকটার দিকে তাকালো। কিছু সময় চুপ করে থাকল। এরপর বলল— তুমিই এতক্ষণ কথা বলছিলে?

হ্যাঁ, আমি কথা বলছিলাম।

কী আশ্চর্য! তুমি মানুষের মতো কথা বলতে পারো?

না, পারি না। তবে বিশেষ মানুষের সাথে পারি।

আমি কি বিশেষ মানুষ?

এ মুহূর্তে তুমি আমার জন্য বিশেষ মানুষ।

কী বলছ তুমি?

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। একটু অপেক্ষা করো। আমি কাকানিকে ডাকছি। ও তোমার সাথে সুন্দর করে কথা বলবে।

কাকানিটা কে?

কাকানি আমার স্ত্রীর নাম।

তাহলে তোমার নাম কী?

কাকাতি।

ক্বা! ক্বা! ক্বা!

সুব্হা কানে আঙুল দিয়ে ফেলল। যাতে করে শব্দটা শোনা না যায়।

ক্বা-আ! ক্বা-আ! ক্বা-আ!

সুব্হা আবার আঙুল কানে দিলো। এরপর কাকটার দিকে তাকিয়ে বলল- এই! তুমি এত জোরে ডাকছ কেন?

কাকাতি ডাক বন্ধ করল। এরপর সুব্হাকে উদ্দেশ্য করে বলল- ঠিক আছে, আর ডাকব না। কিন্তু কী করব বলো। কাকানি অনেক দূরে তো, এই জন্য জোরে ডাকতে হচ্ছে।

কত দূরে সে?

ধরো পাঁচ ক্রোক।

পাঁচ ক্রোক মানে কী?

এটা আমাদের হিসাব। আমরা এভাবে দূরত্ব মাপি।

কিন্তু এটা কত দূরে তা আমি কীভাবে বুঝব?

আচ্ছা কাকানি আসুক। ও তোমাদের পড়ালেখা একটু একটু পারে। ও তোমাকে বুঝিয়ে দেবে।

কেন, তুমি পারো না?

আমি তো আমাদের পড়ালেখাও পারি না।

তাহলে তুমি মূর্খ কাক?

লজ্জা লাগছে। কিন্তু তারপরও বলছি- হ্যাঁ।

কী আশ্চর্য! তুমি পড়ালেখা করনি কেন?

ছোটোবেলায় মারামারি করতে করতে সময় চলে গেল। বড়ো হয়ে আর সময় বের করতে পারছি না।

এখন বুঝলে তো। ছোটোবেলায় সময় নষ্ট করলে বড়ো হয়ে পস্তাতে হয়।

হ্যাঁ, খুব বুঝতে পারছি।

কই, তোমার কাকানি কই?

ও আসছে। আমি দেখতে পাচ্ছি।

অল্প সময়ের মধ্যে আরেকটা কাক এসে কাকাতির পাশে বসল। সুব্‌হা বুঝতে পারল, এ হচ্ছে কাকানি।

তারা দু'জনে কী যেন বলছে। সুব্‌হা তাদের ভাষা বুঝতে পারছে না। কিছু সময় পর কাকানি সুব্‌হাকে উদ্দেশ্য করে বলল- আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

সুব্‌হা সালামের জবাব দিলো। এরপর বলল- তুমি এত সুন্দর করে সালাম দেওয়া কোথা থেকে শিখেছ?

তোমাদের থেকে।

আমাদের থেকে মানে!

তোমরা একজন অন্যজনকে দেখলে যে সালাম দাও, তা দেখে শিখেছি।

কিন্তু কাকাতি তো সালাম দেয়নি।

আমি তো তোমাকে বলেছিলাম। আমি মূর্খ কাক। কাকাতি বলল।

হ্যাঁ, তা অবশ্য বলেছিলে। আচ্ছা, কাকানি আমাকে কী যেন বলবে বলেছিলে।

হ্যাঁ। এই কাকানি! তুমি ওকে পাঁচ ক্রোক ওদের হিসাবের সাথে মিলিয়ে দাও তো। কাকাতি কাকানিকে উদ্দেশ্য করে বলল।

আচ্ছা। তোমাদের তিন কিলোমিটার সমান আমাদের এক ক্রোক। তাহলে তিন পূরণ পাঁচ। সমান সমান পনেরো কিলোমিটার। ও যখন আমাকে ডাকছিল তখন আমি পনেরো কিলোমিটার দূরে আমার নানির বাড়িতে ছিলাম। কাকানি সুন্দর করে বলল।

এত দূরে ওর আওয়াজ যায়! সুব্‌হা আশ্চর্য কণ্ঠে বলল।

আরো দূরেও যায়। তাই না কাকাতি? কথাটা বলে কাকানি কাকাতির দিকে তাকালো ।

কাকাতি একটু হেসে বলল, আগে তো আরো দূরে যেত। এখন তো একটু একটু বুড়ো হচ্ছি। তাই বেশি জোরে ডাকতে পারি না।

এটাও তো কম দূর না। আমরা তো চিৎকার করলে এক কিলোমিটার দূরেও যায় না। সুব্‌হা চিন্তিত কণ্ঠে বলল।

তোমরা আরো দূরে আওয়াজ পাঠাতে পারো। কাকানি বলল।

কী বলছ তুমি! সুব্‌হা আশ্চর্য কণ্ঠে বলল।

হ্যাঁ ঠিকই বলছি। কাকানি বলল।

কীভাবে?

এই যে ধরো মাইক, মোবাইল, বেতার, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট। এগুলোতে তো শুধু শব্দ না, ছবিসহ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পাঠাচ্ছো তোমরা মুহূর্তের মধ্যে। এজন্য আমাদের মতো তোমাদেরকে চিৎকারও করতে হচ্ছে না। শুধু বুদ্ধি খরচ করতে হচ্ছে মাত্র। তোমরা দিন দিন সহজভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছবি, শব্দ পাঠাচ্ছো। আর আমরা তো সৃষ্টি থেকে এখন পর্যন্ত এক নিয়মের মধ্যেই থেকে গেলাম। চিৎকারই করে যাচ্ছি। কাকানি



একটানে কথাগুলো বলল।

ও আচ্ছা বুঝলাম। সুব্‌হা বলল।

এটা কীসের জন্য পারছ তোমরা, জানো? কাকানি বলল।

কীসের জন্য?

বুদ্ধির জন্য। জ্ঞান-বুদ্ধিতে তোমরা সব প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ জ্ঞান-বুদ্ধিই তোমাদের সকল কাজকে সহজ করে দিচ্ছে।

হ্যাঁ, তা অবশ্য তুমি ভুল বলোনি।

আচ্ছা ভাই। তুমি আমাদেরকে এখন একটা বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে? কাকানি কোমল কণ্ঠে বলল।

সুব্‌হা উৎসুক কণ্ঠে বলল, কী বিপদ?

আমাদের বাসায় এখন ডিম আছে। তুমি দেখতে পাচ্ছো?

হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।

এই ডিমগুলোর উপর একটা বিপদ উপস্থিত হয়েছে।

কী বিপদ?

আগামী দিন এই গাছটা কেটে ফেলবে।

তাই নাকি!

হ্যাঁ।

গাছ কাটলে তোমাদের কী সমস্যা?

আমাদের কোনো সমস্যা নেই। আমরা তো উড়ে দূরে চলে যাব। কাকাতি দীর্ঘ সময় পরে কথা বলে উঠল।

ভালোই হবে। তোমাদের চিৎকার আর আমার কানে আসবে না। আমি শান্তিতে ঘুমাতে পারব। সুব্‌হা খুশি খুশি কণ্ঠে বলল।

আমি তো শুধু আজ চিৎকার করেছি। তাও ও আসতে দেরি করছে দেখে। কাকাতি অভিমানি কণ্ঠে বলল।

হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক বলেছ। সুব্‌হা মিনমিন করে বলল।

আর চিৎকার করব না। কাকাতি বলল।

ঠিক আছে এবার বলো। ডিম বিষয়ে কী যেন বলছিলে। সুব্‌হা বলল।

গাছ কেটে ফেললে আমাদের ডিমগুলো তো গাছ থেকে পড়ে ভেঙে যাবে। কাকানি করুণ কণ্ঠে বলল।

তোমাদের ডিম না কোকিলের ডিম?

এগুলো আমাদের ডিম। কি বলো কাকানি, কাকাতি বলল।

হ্যাঁ, এগুলো আমি পেড়েছি। কাকানি দৃঢ়তা নিয়ে বলল।

কিন্তু আমরা তো বইতে পড়েছি কাকের বাসায় কোকিল ডিম পাড়ে।

সব কাকের বাসায় যদি কোকিল ডিম পাড়ত, আর সব কাকের ডিম যদি বাসা থেকে ফেলে দিত, তাহলে তো পৃথিবীতে কাকের জন্ম হতো না। সব কোকিলে ভর্তি হয়ে যেত। আচ্ছা তুমিই বলো। পৃথিবীতে কাক বেশি না কোকিল বেশি? কাকানি একটানে কথাগুলো বলল।

কাক বেশি। সুব্‌হা তড়িৎ জবাব দিলো।

তাহলে তোমরা যে পড়ছ তা কি একশত ভাগ সত্যি?

আচ্ছা। সত্যি মিথ্যে থাক। এখন বলো আমাকে কী করতে হবে?

তুমি আমাদের ডিমগুলোকে বাঁচাও। কাকাতি ও কাকানি একসাথে করুণ কণ্ঠে কথাটা বলতে লাগল।

সুব্‌হা তাদের দুঃখ বুঝতে পারল। ডিমের ভেতরের বাচ্চার জন্য তাদের করুণ আর্তি সুব্‌হার হৃদয়ে কোমলভাবে আঘাত করল। তার মন হঠাৎ করে কেমন যেন হয়ে গেল। সে কাক দুটোর চোখের দিকে তাকালো। তাদের চোখে অশ্রু টলমল করছে, তাদের বাচ্চাদের।

সুব্‌হার মনে হলো তার চোখেও অশ্রু এসে যাচ্ছে। সে দ্রুত চোখের দিকে হাত নিলো। তার ভেজা চোখ তার হাতের তালুতে লাগল।

ভাই, তুমি কি আমাদের ডিমগুলোকে বাঁচাবে? দু'জনে আবার বলে উঠল।

আচ্ছা, দেখি কী করা যায়।

কথাটা বলেই সুব্‌হা জানালা বন্ধ করে দিলো।

## দুই

পরদিন সকালবেলা।

আমগাছ কাটার জন্য দু'জন লোক করাত, রশি নিয়ে গাছের নিচে এল। কিছু পরে আরো কয়েকজন এল।

তাদের হাতে দা, কুড়াল ইত্যাদি।

সুব্‌হা তার আব্বুর সামনে দাঁড়ানো। তার আব্বু পত্রিকা পড়ছে। পাশে তার আম্মু বসে চা খাচ্ছে। সুব্‌হা তার আব্বুকে উদ্দেশ্য করে বলল- আব্বু! তোমার সাথে আমার কথা আছে।

বলো। পত্রিকায় চোখ রেখে তার আব্বু বলল।

পত্রিকা না সরালে বলব না।

সুব্‌হার আব্বু পত্রিকা থেকে চোখ সরালো। সুব্‌হার দিকে তাকালো। এরপর বলল; আচ্ছা বলো, কী বলবে আমাকে। আমাকে একটা জিনিস কিনে দেবে?

কী জিনিস?

আমগাছ।

কী গাছ? সুব্‌হার আব্বু সরু কণ্ঠে বলল ।

আমগাছ। সুব্‌হা দ্বিতীয়বার বলল।

আমগাছ তো ছাদের টবে একটা আছে। তার আম্মু বলল।



টবের গাছ না। পুকুর পাড়ের বড়ো আমগাছটা।

সুব্হার আব্বু সোজা হয়ে বসল। মেয়ের দিকে ভালো করে তাকালো। এরপর শান্ত কণ্ঠে বলল- ওই আমগাছ দিয়ে তুমি কী করবে?

ওখানে একটা কাকের বাসা আছে। কাকের বাসায় ডিম আছে। আমার রুমের জানালা বরাবর। ওরা গাছটা কেটে ফেলতে এসেছে। গাছ কাটলে বাসা ভেঙে যাবে। ডিম ভেঙে যাবে। তুমি ওই গাছটা আমাকে কিনে দাও। সুব্হা রোবটের কণ্ঠে কথাগুলো বলল। সুব্হার আব্বু, আম্মু দু'জন কিছু সময় নিশ্চুপ বসে থাকল। এরপর তার আম্মু বলল- আচ্ছা, চলো দেখি। কোথায় বাসা।

সুব্হা তার আব্বু, আম্মুসহ রুমে এল। কাকাতি এবং কাকানি বাসায় আছে। তাদেরকে দেখে তারা সালাম দিলো। সুব্হা মনে মনে সালামের উত্তর দিলো। তার আব্বু, আম্মু কিছুই বুঝতে পারল না।

সুব্হার আব্বু বলল- আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয় সুব্হা?

কী কাজ আব্বু?

আমরা ওই বাসাটা এনে আমাদের ছাদে টবের আম গাছে দিলে কেমন হয়।

সুব্হা কথাটা শুনল। কাকাতি আর কাকানির দিকে তাকালো।

কাকানি করুণ কণ্ঠে বলতে লাগল; না ভাই না। ওখানে রাখলে বিড়াল আমাদের ডিমগুলো খেয়ে ফেলবে।

সুব্‌হা কথাটা শুনল। তার আব্বু আম্মু শুনল না। সে তাদেরকে শোনানোর জন্য বলল; ওখানে রাখলে বিড়াল ডিমগুলো খেয়ে ফেলবে।

সুব্‌হার আম্মু তখন বলে উঠল; হ্যাঁ, ও তো ঠিক কথাই বলেছে। এই! তুমি ওই গাছটা কিনে ফেলো। দেখছ না, গাছে কেমন কচি কচি আম ভর্তি হয়ে আছে। ওগুলো আরেকটু বড়ো হলে আচার দেওয়া যাবে। যাও তো তুমি। এখানে বসে থেকো না। দেখছ না, লোকগুলো ডাল কাটার জন্য গাছে উঠছে।

আচ্ছা, আচ্ছা। আমি দেখছি।

থ্যাংক ইউ আব্বু । সুব্‌হা বলল।

গাছকাটা হলো না। সুব্‌হার আব্বু গাছের মূল্য দুই হাজার টাকা বেশি দিয়ে গাছটা কিনে ফেলল। আম পেকে গেলে গাছ কাটা হবে। তিন মাস পরে। এই শর্তে যারা কাটতে এসেছিল তাদেরকে ফেরত পাঠালো।

কাকানি সুব্‌হাকে উদ্দেশ্য করে বলল; থ্যাংক ইউ সুব্‌হা।

সুব্‌হা সেদিকে তাকিয়ে বলল; কী আশ্চর্য! তুমি কি ইংরেজি জানো?

ও একবার কোনো বিষয় শুনলেই মনে রাখতে পারে। তোমাদের মতো মানুষ হলে ওকে আমি এম এ পাস করাতাম। কাকাতি বলে উঠল।

যাও আর ঢং করতে হবে না। এখন থেকে তোমার ডিউটি হলো, এই গাছের কোনো আম যাতে অন্য কোনো পাখি নষ্ট করতে না পারে। রাতে যেন কোনো বাদুড় না বসে। কোনো মানুষ আম চুরি করতে চাইলে তুমি চিৎকার করে উঠবে। যাতে করে সুব্‌হার আম্মুর আমগুলো রক্ষা পায়। সুব্‌হা আমাদের আগত বাচ্চাদের বাঁচিয়েছে। তুমি তাদের সম্পদ বাঁচাবে। কাকানি দৃঢ় কণ্ঠে কথাগুলো বলল।

সুব্‌হা সব কথা শুনল। এরপর তার আম্মুর সাথে জানালার পাশ থেকে সরে এসে ডাইনিং রুমের দিকে চলল। তার খুব ক্ষিদে লেগেছে।

তিন

সেদিন থেকে ঘটতে লাগল বিশেষ কিছু ঘটনা।

কোনো বাচ্চা গাছে ঢিল ছুঁড়লেই একটা কাক ক্বা ক্বা করে চিৎকার করে ওঠে। কোনো পাখি ওই গাছটার কাছে এলে একটা কাক তাদেরকে ধাওয়া করে তাড়িয়ে দেয়। রাতে কোনো বাদুর গাছের কাছাকাছি এলেই একটা কাক তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এরপর একদিন দেখা গেল কাকের বাসায় ছোটো ছোটো ছানা। কাকানি তাদের পাশে। সুব্‌হা জানালা খুলে বাচ্চাগুলোকে দেখছে।

কাকানি বাচ্চাগুলোকে উদ্দেশ্য করে বলল- সোনামনিরা! ওনাকে আসসালামু আলাইকুম বলো। উনি তোমাদের সুব্‌হা খালমনি।

বাচ্চাগুলো সমস্বরে সুব্‌হাকে সালাম দিলো। সুব্‌হা সালামের জবাব দিলো।

কাকাতি বলে উঠল- সুব্‌হা, আমি কি তোমার ওয়াদা রাখতে পেরেছি?

হ্যাঁ পেরেছেন। একটা আমও কেউ নষ্ট করতে পারেনি।

কাকাতি, কাকানি ও বাচ্চাগুলো সুব্‌হার দিকে খুশি খুশি চোখে তাকিয়ে আছে।

সুব্‌হার আম্মু রুমে ঢুকল। দেখল সুব্‌হা দাঁড়িয়ে আছে জানালার পাশে। সে বাইরে তাকিয়ে আছে। তার পেছনে এসে বলল- সুব্‌হা, কী দেখছ?

আম্মু! ওই দেখো, কী সুন্দর।

সুব্‌হার দেখানো দিকে তার আম্মু তাকালো। আনন্দে তার চোখ চিকচিক করতে লাগল। ❑

---

কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও গবেষক

# বৈশাখি আনন্দ মেলা

কাওছার মাহমুদ




পান্তা, ইলিশ, পিঠা, মুড়ি...
স্বাদে ভরা বৈশাখের খাবার।


শিশু পার্কে দোলনা, নাগরদোলা
ছোটোদের আনন্দের শেষ নেই।


বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রে খেলাধুলা আর
মজার সব আয়োজন।


সবাইকে বৈশাখের
আন্তরিক শুভেচ্ছা।

গল্প



# শিশিরের গ্রামে ফেরা

## তাপস কুমার দত্ত

সকালে শিশিরের ঘুম ভাঙে কান্নার শব্দ শুনে। আধো ঘুমে সে দেখতে পায় তার মা কান্নাকাটি করছে।

বাবাকে বলছেন, আজকেই মামাবাড়ি যেতে চায় মা।

মামাবাড়ি নিয়ে তেমন কোনো স্মৃতি নেই। মা কেন মামাবাড়ি যায় না, জানে না শিশির। তবে সে শুনেছে, তার শিশির নামটা নাকি বড়ো মামা দিয়েছিলেন। অনেকদিন আগে বড়ো মামা তাদের ঢাকার বাসায় এসেছিলেন। শিশিরের তখন পাঁচ বছর বয়স।

বড়ো মামা বলেছিলেন, জানিস তুই আমাদের বাড়িতে জন্মেছিস। তোর জন্মের রাতে কী যে শিশির পড়েছিল রে! উঠোনে পা দিতেই ভিজে যাচ্ছিল। বাঁশপাতা নুয়ে পড়েছিল, আমগাছের ডালে জল টুপটাপ পড়ছিল। সেই ভেজা রাতেই তুই পৃথিবীতে এলি।'

শিশির তখন ছোটো ছিল, বুঝত না বড়ো মামার এসব কঠিন কঠিন শব্দের কথা। এখন একটু বড়ো হয়ে, অষ্টম শ্রেণিতে বাংলা বই পড়তে পড়তে তার মনে হলো- তার জন্মের সঙ্গে প্রকৃতির একটা সম্পর্ক আছে।

কিন্তু তার জীবনটা ছিল ঠিক উলটো। ঢাকার এক ছোট্ট ফ্ল্যাটে সে বড়ো হয়েছে। একটাই ঘর- সেই ঘরেই পড়া, খাওয়া, ঘুম। বারান্দা আছে, কিন্তু খুব ছোটো। জানালার বাইরে আরেকটা বিল্ডিংয়ের দেয়াল। আকাশ দেখা যায় কিন্তু পুরো না- একটুখানি।

সকাল হলেই তাড়াহুড়া। স্কুলে যেতে হবে। স্কুল থেকে এসে কোচিং। তারপর আবার পড়া। মাঝে মাঝে টিভি দেখা। এটাই তার চব্বিশ ঘণ্টা, সাত, দিন, পুরো মাসের রুটিন। এমনকি বার্ষিক পরীক্ষার ছুটি, গরমের ছুটি, রমজানের ছুটি, ঈদের ছুটি- কোনো ছুটিতে কোথাও যাওয়া হয় না।

কিন্তু আজ মায়ের হঠাৎ কী হলো- মামাবাড়ি যাওয়ার জন্য উতলা হয়ে উঠল!

তার মামাবাড়ি ফরিদপুরের গণ্ডগ্রামে। গ্রামের কথা সে শুনেছে অনেক। বন্ধুদের মুখে, মায়ের মুখে। কিন্তু কখনো যাওয়া হয়নি।

সকালে মায়ের কান্নাকাটির পর দুপুরে বাবা মায়ের সঙ্গে শিশিরকে মামাবাড়িতে যাওয়ার বাসে তুলে দিলেন। বাবার মুখে এমন একটা দুঃখের ছায়া ছিল যে শিশির কিছুতেই বুঝতে পারছিল না যে আসলে কী ঘটছে।

চৈত্র মাসের শেষ। বাসে বসে শিশির জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল। প্রথমে ছিল শুধু বিল্ডিং, গাড়ি, ধোঁয়া। তারপর ধীরে ধীরে বদলে গেল সব। মাঠ দেখা গেল। গাছ দেখা গেল। দূরে কোথাও জলাশয় চিকচিক করছে।

শিশির অবাক হয়ে দেখছিল। এত খোলা জায়গা সে আগে কখনো দেখেনি। গ্রামে পৌঁছেই সে প্রথম থমকে দাঁড়ায়। আকাশটা যেন হঠাৎ বড়ো হয়ে গেছে। এত বড়ো আকাশ! কোনো বিল্ডিং নেই, কোনো দেয়াল নেই। শুধু খোলা নীল আকাশ।

মামাবাড়িতে পৌঁছুতেই বড়ো মামা এসে শিশিরকে কোলের কাছে নিয়ে বসালেন। মামি হাসতে হাসতে বললেন, শিশিরকে আর যেতে দেওয়া হবে না। এখানেই আটকে রাখা হবে।

শিশির একটুখানি ভয় পেল।

কোথা থেকে হঠাৎ বড়ো মামার ছেলে সুজন এল। তার সমবয়সি। বলল, 'চল, মেলা দেখবি।'

শিশির একটু অবাক হয়— মেলা?

হুম...। চৈত্রসংক্রান্তির মেলা, চল যাই।

কলারণ গ্রামের মেলাটা ছিল একেবারে অন্যরকম।

মাঠের ওপর বসেছে মেলা। ঢোকার মুখে বাঁশের ফটক। রঙিন কাগজ ঝুলছে। ভেতরে ঢুকতেই শব্দ- ঢোল বাজছে, বাঁশি বাজছে, লোকজন কথা বলছে, হাসছে।

শিশির চারদিকে অবাক বিস্ময়ে তাকাচ্ছে। ছোটো ছোটো ছেলে- মেয়েরা চিৎকার করে হাসছে। ওপরে উঠলে নাকি পুরো গ্রাম দেখা যায়- সুজন বলল। আরেক কোণে পুতুলনাচ। কাঠের পুতুল নাচছে। একজন গান গাইছে। তার গলার আওয়াজ কেমন মিষ্টি। শিশির দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। পুতুলগুলো যেন সত্যি কথা বলছে!

একটু দূরে কোথা থেকে গানের সুর ভেসে আসছে।

সেদিকে শিশির তাকাতেই সুজন বলল, ওটা কবিয়াল গান।

কী সব অদ্ভুত নাম! শিশির কিছু কিছু নাম এর আগে বইতে পড়েছে, তবে কখনো দেখেনি।

কবির চারদিকে লোকজন গোল হয়ে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে।

আরেকদিকে অসংখ্য খাবারের দোকান। কত বিচিত্র রকমের মিষ্টি, পুরি, মোগলাই। গরম জিলাপির গন্ধে শিশিরের জিভে জল আসে।

খেলনার দোকানে মাটির ঘোড়া, বাঁশের বাঁশি, রঙিন ঘুড়ি। শিশির একটা বাঁশি কিনে ফুঁ দিল। সে হেসে ফেলল।

মেলায় ভিড় হলেও কেউ কাউকে ধাক্কা দেয় না। সবাই যেন আপন। সন্ধ্যা নামলে লণ্ঠন জ্বলে। আলোটা নরম। কেমন যেন শান্ত।

সেদিন রাতে ঘুমোতে গিয়ে শিশির ভাবল- কী হলো হঠাৎ? কেন মা তড়িঘড়ি করে মামাবাড়ি ছুটে এল?

পরদিন ছিল পয়লা বৈশাখ।

ভোরে ঘুম ভাঙতেই শিশিরের মনে হলো— সে যেন অচেনা প্রকৃতির নাগরদোলায় বসে আছে। উঠোনে বেরিয়ে দেখল আকাশে লালচে আলো। গাছের পাতা নতুন। বাতাসে একটা অন্য রকম গন্ধ। সুজন তাকে নিয়ে যায় কুমার নদীর পাড়ে। নদীটা বড়ো না, আবার ছোটোও না। জল ধীরে ধীরে বয়ে যাচ্ছে। তীরের ঘাসে হাওয়া লাগে।

সুজন বলল, 'আজ তোকে মাছ ধরা শিখাবো।'

সে একটা ছিপ দিলো। মাছের খাবার, টোপ- সব ঠিক করে দিলো।

'চুপ করে বসে থাকবি।' সুজন বলল।

শিশির চুপ করে বসে থাকে। প্রথমে একটু অস্থির লাগে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

হাওয়ার শব্দ শুনতে পায়। পাতার শব্দ। দূরে কারো কথা।

হঠাৎ তার ছিপ নড়ল।

'টান দে!' সুজন চিৎকার করল।

শিশির টান দিলো। ছোটো একটা মাছ উঠল। মাছটা লাফাচ্ছে। রোদে চকচক করছে।

পুঁটি মাছ! সুজন হেসে বলল।

শিশিরের মুখে হাসি ফুটে উঠল। তার মনে হলো- সে যেন বড়ো কিছু পেয়েছে।

দুপুরে গরম পড়ে। কিন্তু গাছের ছায়ায় বসলে গরম কম লাগে। বিকেলে মাঠে হাঁটা, গাছে উঠে কাঁচা আম পেরে খাওয়া, আর কত ধরনের গল্প সুজনের সঙ্গে চলতে থাকে।

আর রাত হলেই- একটা নতুন জগৎ। গ্রামে কিছুদিন হলো বিদ্যুৎ এসেছে। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ থাকে না। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরই হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যায়। গতকাল শিশির ভয় পেয়েছিল। কিন্তু আজ আর ভয় লাগল না। মামাবাড়ির উঠোনে খেজুর পাতার পাটি পাতা হয়। পাটির গায়ে একটা শুকনো পাতার গন্ধ।

সুজন পাটিতে শুয়ে চারদিকে দেখে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে একটা গা ছমছমে ভাব।

শিশির উপরে তাকায়।

তার বুক ধক করে ওঠে।

এত তারা!

ঢাকায় সে কখনো এত তারা দেখেনি। আকাশ যেন ভরে গেছে আলোয়। ছোটো ছোটো বিন্দু- কেউ জ্বলছে, কেউ মিটমিট করছে।

সে গুণতে যায়-পারে না।

সুজন বলে, 'ওগুলো নক্ষত্র।'

বড়ো মামা কোন ফাঁকে পাশে এসে বসেছেন। বলেন, 'ওই যে উত্তর আকাশে প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো সাতটি তারা, ওর শেষের দিকে লম্বা লাইন টানলে ধ্রুবতারা দেখতে পাবে।'

ধ্রুবতারা! যে তারা সব সময় উত্তর আকাশে থাকে। শিশির অবাক হয়ে ভাবে— সেটা সত্যিই আকাশে দেখা যায়!

ছোটো মামা এসে গল্প শুরু করেন- কোনোটা ভূতের কোনোটা রূপকথার। শিশির চুপ করে শোনে। তার মনে হয়- এই আকাশ, এই গ্রামটা গল্পে ভরা।

বাঁশবাগানের দিকে তাকালে দেখা যায়- ঝোপের ভেতর জোনাকি জ্বলছে। একবার জ্বলে, আবার নিভে যায়।

শিশির উঠে বসে। সে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে।

জোনাকিগুলো যেন ছোটো ছোটো আলো। মনে হয়- মাটির ওপর তারা নেমে এসেছে।

হাওয়া ধীরে ধীরে বয়ে যায়। গায়ে লাগে।

দূরে ঝিঁঝি পোকার ডাক। মাঝে মাঝে কুকুর ডাকে। তারপর শিয়ালের হুক্কাহুয়া! একটানা ডেকেই চলে এক পাল শিয়াল। দেখা যায় না তাদের। শুধু শব্দ শোনা যায়।

অদ্ভুত একটা রাত পার করে শিশির।

পরের রাতে ছিল পূর্ণিমা। সূর্য পশ্চিমে অস্ত যেতেই আকাশে মস্ত বড়ো একটা গোল চাঁদ উঠল।

চাঁদের আলোয় উঠোন ভরে গেল। গাছের ছায়া পড়ে রইল মাটিতে। সবকিছু যেন অন্য রকম হয়ে গেল। গতকালকের মতো পাটি বিছিয়ে আজকেও গল্প চলতে থাকে। কিন্তু শিশির চুপ করে তাকিয়ে থাকে গোল চাঁদের দিকে। চাঁদের আলোয় তার মনটা কেমন নরম হয়ে যায়।

সে শুয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুম আসে না।

তার মনে হয়- সে নতুন কিছু বুঝছে।

এভাবেই চার দিন কেটে যায়। একদিন কালবৈশাখি ঝড় উঠল। আকাশ কালো। হাওয়া জোরে বইছে।

আমগাছ থেকে ঝপাঝপ করে আম পড়ছে।

'চল!' সুজন দৌড় দিলো।

শিশিরও দৌড়ালো।

ঝড়ের মধ্যে তারা আম কুড়ালো। কাঁচাপাকা মিশে গেছে। ঘরে এসে নুন দিয়ে সেই আম মেখে খেলো। টক, মিষ্টি, ঝাল- একসাথে।



সুজন আম খেতে খেতে বলল, কালকেই নাকি তোরা চলে যাবি?

শিশির অবাক হয়ে বলল, আমি জানি না তো।

সুজন আরেকটা আমের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, আসলে বাবা অনেক অসুস্থ।

শিশির এবার বুঝতে পারল তার মা কেন ছুটে এসেছেন। কিন্তু তার মনে প্রশ্ন রয়ে গেল, কেন সে এতদিন মামাবাড়ি আসেনি।

শিশিরের মনটা খারাপ হয়ে গেল। প্রথম দিন এসে যতটা ভয় পেয়েছিল আজ ততটাই সে দুঃখ ভারাক্রান্ত।

পরের দিন বাসে বসে সে বারবার পিছনে তাকাচ্ছিল। দেখতে পায়, সুজনেরও চোখ ভিজে উঠেছে।

ঢাকায় ফিরে আবার সেই ঘর। কিন্তু এবার সে বদলে গেছে। সে জানে- একটা বড়ো পৃথিবী আছে। একটা আকাশ আছে, যেখানে তারা গোনা যায় না। একটা উঠোন আছে, যেখানে জোনাকি জ্বলে। একটা নদী আছে, যেখানে বসে মাছ ধরা যায়।

পরদিন সকালে সে স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সে শুনল- মা বাবাকে বলছেন, ভাইজান আমার ভাগের জমি বুঝায় দিতে রাজি হইছেন। শিশিরের গ্রাম খুব ভালো লেগেছে। আমরা একটা ঘর তুলে রাখব, প্রতি বছর ছুটিতে বাড়ি যাব।

শিশিরের বুক ধক করে উঠল। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। স্কুলের জামা পরতে ভুলে গেল। তারপর ধীরে ধীরে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

মনে হলো- সেই ফাল্গুনের ভোর আবার ফিরে এসেছে।

আবার শিশির পড়ছে।

তেরো বছর পর তার যেন নতুন করে আবার জন্ম হলো! ❑

---

সহকারী সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক

# নদীমাতৃক বাংলাদেশ

## মো. জাকির হোসেন

বাংলাদেশ নদীর দেশ
সবার জানা কথা
নদী বয়ে আনে
সুখের বার্তা।

পদ্মা, মেঘনা, যমুনা
বয়ে চলে
বাংলার জীবন গড়ে
নদীরই পাড়ে।

নৌকা ভেসে যায়
নদীর বুক চিরে
জেলের জাল পড়ে
ঘেঁসে নদীর তীরে।

# কৃষকের হাসি

## আফসানা ইসলাম বৃষ্টি

ভোরের আলো ফুটতেই
কৃষক যায় মাঠে
ঘাম ঝরিয়ে কাজ করে
সোনালি ফসল ফলাতে।

ধানের ক্ষেতে যখন
সোনালি ঢেউ খেলে
কৃষকের সুখ তখন
হৃদয়েতে দোলে।

দেশের গর্ব এই
পরিশ্রমী প্রাণ
তাদের জন্য রইল
শ্রদ্ধা ভরা গান।

দশম শ্রেণি, জামালপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

# বৈশাখি ফল



গল্প



# মেঘপরির দেশে

## রেজাউল রেজওয়ান

ছোট্ট মেয়ে টুম্পা। দেখতে একেবারে পুতুলের মতো। তাই দাদু মনি আদর করে ওকে 'টুম্পা' বলেই ডাকে। সে থেকে ওই নামটাই এখন সবার মুখে মুখে। দেখতে দেখতে ওর বয়স সাত পেরিয়ে এখন আটে। পাশেই একটা কিন্ডারগার্টেনের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। ওদের স্কুল সকালে। আটটায় শুরু আর এগারোটায় ছুটি। পড়ালেখার চাপ কমই বলা যায়। সারাদিনই পুতুল ও অন্যান্য খেলনা নিয়ে খেলে টুম্পা। সন্ধ্যার পরে স্কুলের পড়াগুলো সেরে ফেলে। যে কারণে দুপুরে আর বিকেলবেলায় খেলাধুলা করা ছাড়া আর কোনো কিছু করারও নেই। এমনি এক অলস বিকেলে টুম্পা তার আম্মুর সাথে বাড়ির ছাদে গিয়ে ছাদ বাগানের ফুল গাছের পরিচর্যা করছে। টুম্পা ছোটো হলেও ফুল গাছের ফুলগুলোকে কখনো অযথা ছিঁড়ে না। বরং সে মাঝেমধ্যে অল্প অল্প করে গাছে পানি দেয়। কিন্তু সেদিন কী মনে করে টুম্পাকে ওর মা ছাদে একা রেখেই নিচের ঘরে কিছুক্ষণের জন্য চলে গেল। টুম্পা এতে মোটেও ভয় পায়নি কারণ সে ওখানে নিরাপদেই ছিল।

টুম্পা ফুল বাগানে হাঁটাহাঁটি করছিল। ছাদে থেকে খেয়াল করল, আজকের আকাশটা ভারি সুন্দর! নীল আকাশের ভুবন জুড়ে সাদা মেঘগুলো চমৎকার একটা আবহ নিয়ে ভেসে আছে। টুম্পার মনে হলো, ইশ্! আমি যদি এই সাদা মেঘগুলো ধরতে পারতাম, তাহলে ওগুলো নিয়ে আমি তুলোর মতো উড়িয়ে উড়িয়ে খেলতাম। তখন কী মজাই না হতো! ওর এই ভাবনা কী করে জানি মেঘের ভেতর লুকিয়ে থাকা মেঘপরিটা বুঝতে পারল। ঠিক তখনি টুম্পার কাছাকাছি আকাশের সাদা মেঘের কুণ্ডলি থেকে ফুটফুটে ধবধবে সাদা এক মেঘপরি ছাদ বাগানে নেমে এল। টুম্পা মেঘপরি দেখে ভীষণ খুশি হলো। পরিটা টুম্পাকে প্রথমেই এত্ত এত্ত ধবধবে সাদা ফুল

দিল। ঠিক আকাশের সাদা মেঘের মতো। পরিটা বলল, তুমি আমার সাথে ওই মেঘপরির দেশে যাবে? ওখানে এই ফুলের চেয়েও সুন্দর অনেক কিছু আছে। অবশ্যই যাব, কিন্তু কীভাবে যাব? টুম্পা বলল। 'এই দেখো মেঘের নাও', এই কথা বলার সাথে সাথে সাদা একটা মেঘের নৌকা ওদের সামনে এসে পড়ল। ওটাতে উঠে ওরা দু'জনে মেঘপরির দেশে উড়ে চলল। পথের মধ্যে টুম্পা সাদা মেঘগুলোকে আলতোভাবে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল। আকাশে ভেসে থাকা মেঘের গণ্ডি পার হয়ে ওরা ধবধবে সাদা একটা পাহাড়ের উপর মেঘপরির দেশে পৌঁছে গেল।

সেখানে বড়ো পরিদের সাথে টুম্পার মতো ছোটো পরিরাও আছে। ওরা একটা ফুল বাগানে সবাই ঢুকল। ও মা! কত্ত সুন্দর সুন্দর ফুল! টুম্পা অবাক হয়ে গেল। মুক্তোর মতো একটা ফুল ছিঁড়ে টুম্পা ওর কানে গুজল। অন্য মেঘপরিরা গেয়ে উঠল, 'মুক্তোর মতো ফুল, এ তো কানের দুল'। আরো অনেক ছড়া সবাই ছন্দের তালে আবৃত্তি করতে লাগল। নাচতেও লাগল। বড়ো পরিটা বলল, টুম্পা তুমি কী খাবে? টুম্পা বলল, আমি চকলেট খাব। পরিরা বিভিন্ন স্বাদের চকলেট, মিষ্টি আর নানান রকমের ফল নিয়ে এল। সবাই খুব মজা করে এসব খেলে বড়ো পরিটা সবাইকে রূপকথার কয়েকটা মজার গল্প শোনালো। সেই রূপকথা শুনে টুম্পা বলল, তোমরা এত্ত মজার মজার গল্প জানো, কিন্তু আমার আম্মু তো আমাকে একটাও গল্প শুনায় না। তখন বড়ো মেঘপরিটা বলল, তোমার আম্মু ও নানি-দাদিরা অনেক গল্প জানে, তুমি তাদেরকে আজই গিয়ে গল্প শোনানোর জন্য আবদার করবে। দেখবে তারাও তোমাকে অনেক মজার মজার গল্প শোনাবে। মেঘপরিটা সবার উদ্দেশ্যে আরো বলল, 'শোনো, শুধু গল্প শুনলেই হবে না। বড়োরা যেভাবে বলে সে মতো চলবে। ঠিকমতো পড়াশোনা করবে। পড়ার সময় পড়বে, খেলার সময় খেলবে, সময়মতো ঘুমাবে, সকালে সবার আগে ঘুম থেকে উঠবে। এসব সময়মতো করতে পারলে সবাই তোমাদের আদর করবে, ভালো ভালো জামা, চকলেট কিনে দেবে। আর মজার মজার গল্পও শোনাবে।'

গল্প করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বড়ো মেঘপরিটা বলল, 'চলো তোমাকে তোমার বাসায় দিয়ে আসি। তোমার আম্মু তোমাকে খুঁজবে।' মেঘের নৌকায় উঠে ওরা দ্রুতই ছাদের সেই বাগানটায় পৌঁছে গেল আর



মেঘপরিটাও চলে গেল। টুম্পার আম্মু কিছুই বুঝতে পারেনি। টুম্পা ছোট্ট মেয়ে, অত কিছু সে বোঝে না। তবে মেঘপরির ভালোবাসা আর সেই উপদেশগুলো পুরোটাই ওর মনের ভেতর গেঁথে রয়েছে। সে এখন মন দিয়ে পড়াশোনা করে, বড়োদের কথামতো চলে, সকালে সবার আগে ঘুম থেকে ওঠে। তাই সবাই ওকে খুব আদরও করে আবার মজার মজার গল্পও শোনায়। ❑

---

শিশুসাহিত্যিক ও ছড়াকার



# পৃথিবীর মডেল

## সাধন সরকার

হাসিব স্যার বোর্ডে একটি বৃত্ত আঁকলেন। হাতে থাকা একটি কমলালেবুও শিক্ষার্থীদের দেখালেন। তিনি নবম শ্রেণির সব শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'শিক্ষার্থীরা বলো, আমাদের পৃথিবীটা ঠিক কেমন? পুরোপুরি গোল, নাকি কমলালেবুর মতো!' স্যার জানিয়ে দিলেন শুধু একটা অপশন বেছে নিতে হবে এবং ব্যাখ্যা করতে হবে। তিনি গ্রুপ করে দিলেন। দলগত কাজের সময়ও নির্ধারণ করে দিলেন। যাতে শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। শিক্ষার্থীরা চিন্তায় পড়ে গেল! অনেকেই ভ্রু কুঁচকাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা মোটা দাগে দুই ভাগ হয়ে গেল। একদল বলল, 'পৃথিবী বৃত্তের মতো পুরোপুরি গোলাকার। গতিশীল পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে আবর্তন করছে।'

আরেক দল বলল, 'পৃথিবী পুরোপুরি গোলাকার নয়, কিছুটা কমলালেবুর মতো! পৃথিবী নিজের চারপাশে আবর্তনকালে কেন্দ্রমুখী ও কেন্দ্রবিমুখী বলের উদ্ভব হয়। যার প্রভাবে গোলাকৃতি বস্তুর প্রান্তদেশ

কিছুটা চাপা ও মধ্যভাগও কিছুটা স্ফীত হয়। এছাড়া আমরা বিজ্ঞানী নিউটনের ব্যাখ্যা থেকে পাই, পৃথিবী আবর্তনের ফলে মধ্যভাগ সামান্য স্ফীত।'

আলোচনা বেশ জমে উঠেছে। সব শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত ক্লাস হচ্ছে। হাসিব স্যার কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়ে সব গ্রুপকে বললেন পৃথিবীর একটা মডেল বানিয়ে আনতে। পৃথিবী ঘুরলেও আমরা কেন ছিটকে পড়ি না- এ বিষয়ে পরের ক্লাসে বিস্তারিত শুনবেন বলে জানালেন। শিক্ষার্থীরা মহাখুশি।

গ্রুপে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। প্রয়োজনীয় উপকরণও সংগ্রহ করার কাজ চলছে। এক বন্ধু বলে উঠল, 'আমাদের মডেল সেরা হতে হবে। ভিন্ন কিছু করা চাই।'

আরেক সহপাঠী বলল, 'আমরা জোর দিব পুরোপুরি গোলাকার এমন মডেল করতে। অর্থাৎ কিছুটা কমলালেবুর মতো করতে।'

ককশিট ও বল সংগ্রহ, পৃথিবীর ছবি অঙ্কন করা, স্ট্যান্ড বানানোসহ হরেক রকমের কাজ চলছে।

নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী নাফিসের মাথায় ভিন্ন কিছু খেলা করছে। কিন্তু কিছুতেই যেন সেটা বাস্তবে রূপ পাচ্ছে না! মস্তিষ্ক থেকে চিন্তাটা উধাও হচ্ছে না, আবার অঙ্কন করাও কঠিন মনে হচ্ছে। অথচ কালকেই মডেলটি জমা দিতে হবে।

কখন যে নাফিসের ঘুম চলে এসেছে সে টেরই পায়নি। হঠাৎ কে যেন নাফিসের সামনে এসে দাঁড়ালো! একেবারে মানুষের মতো না হলেও আকার-আকৃতি মানুষের মতো!

ঘুম ভেঙে গেল নাফিসের। আগন্তুককে দেখে এতটাই বিস্মিত হয়ে গেল যে, চিৎকার পর্যন্ত করতে পারছে না। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি? কোত্থেকে এসেছ? এখানে কী চাও?'

'ভয় পেও না! আমি তোমার ক্ষতি করব না। তোমার তো পৃথিবীর মডেল আঁকতে হবে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কী করে জানলে?'

'আমি সব জানি।'

'তোমার বাড়ি কোথায়?'

'আমি ভিনগ্রহ থেকে এসেছি। তুমি আমাকে চিনবে না। আমরা তোমাদের আশপাশেই থাকি। এখন কথা না বলে আমাকে এক গ্লাস পানি দাও।'

'তোমরাও পানি খাও!'

'হ্যাঁ, আমরা তোমাদের মতো সব খেতে পারি।'

'তুমি তো দেখছি অনেক কিছু জানো! তোমাদের ভিনগ্রহে কী পড়ালেখা আছে?'

'প্রিয় শিক্ষার্থী, তুমি তো সিলেবাসের বাইরে প্রশ্ন করে বসেছ! আজ পর্যন্ত এমন প্রশ্ন আমাকে আগে কেউ করেনি। লেখাপড়া সবখানে আছে! লেখাপড়া ছাড়া প্রাণীরা কী এগিয়ে যেতে পারে?'

'তুমি কী আমাকে পৃথিবীর মডেল আঁকতে সহায়তা করবে?'

'আরে বোকা, তোমাকে সহায়তা করতেই তো আমি এখানে এসেছি। দ্রুত শুরু করো। রাত শেষ হওয়ার আগেই আমাকে আবার বিদায় নিতে হবে।'

শুরু হলো পৃথিবীর মডেল তৈরির কাজ। নাফিস আগে থেকেই টুকটাক গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ জানত। ভিনগ্রহের প্রাণী তাকে সব দেখিয়ে দিল। নাফিস অবাক হলো। ভিনগ্রহের প্রাণীরা যা পারে মানুষ তা পারে না! পৃথিবীর মডেল যে এত সুন্দর হতে পারে নাফিসের কল্পনাতে ছিল না। ঠিক যেন অবিকল আসল পৃথিবীর মতো দেখতে। রাত শেষ হওয়ার আগেই তৈরি হয়ে গেল পৃথিবীর ত্রিমাত্রিক মডেল। ভিনগ্রহের প্রাণী নাফিসকে ধন্যবাদ জানিয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। প্রস্থানের আগে 'আবার দেখা হবে' বলে ইঙ্গিত দিয়ে গেল। ❑

---

সহকারী শিক্ষক, লৌহজং বালিকা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, মুন্সিগঞ্জ

কবিতায় বৈশাখ

## বৈশাখি মেলা

### কাকলী আক্তার মৌ

বৈশাখি মেলায় আজ
কত রঙের ঢেউ
শিশুদের আনন্দের খবর
জানে না তো কেউ।

হরেক রকম খেলনায়
সেজেছে দোকানের সারি
শিশুরা কিনে নেয়
বাঁশি আর গাড়ি।

নাগরদোলা ঘুরে
আকাশ ছুঁতে চায়
শিশুদের কলরবে
চারদিক ভরে যায়।

অষ্টম শ্রেণি, ঠাকুরগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়



## নদীর আশীর্বাদ

### মোছা. নাওয়ার আলম

নদী দেয় মাছ
আর উর্বর মাটি,
বাংলার মানুষের
সুখের সাথি।

নদীর ঢেউ শেখায়
সময়ের গুরুত্ব
সময় জ্ঞান-ই
সবার জীবনের মহত্ত্ব।

এই নদীর দেশ
আমার বড়ো আপন
বাংলাদেশ আমার
হৃদয়ের স্পন্দন।

দশম শ্রেণি, ময়মনসিংহ জিলা স্কুল, ময়মনসিংহ

## বৈশাখি মেলা

### ইসরাত জাহান রোদেলা

ঝালমুড়ি, বাতাসা
মিষ্টির দোকান
সবাই মিলে করে
আনন্দের গান।

পুতুল নাচ দেখে
শিশুরা দেয় হাততালি
এগুলোই হলো
বাংলার সংস্কৃতি।

ঢোলের শব্দ বাজে
দূর গ্রাম পেরিয়ে
উৎসবের আনন্দে সুর
বাজে বাঙালির হৃদয়ে।

দশম শ্রেণি, এস.ভি. সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ

## পান্তা-ইলিশ

### রিয়াজুল কবীর

পহেলা বৈশাখ এল
নতুন সুখ নিয়ে
পান্তা-ইলিশ সাজে
ভালোবাসা দিয়ে।

মাটির থালায় থাকে
কাঁচা মরিচ ভর্তা,
বাংলার খাবারে
মিশে আছে ঐতিহ্য গাঁথা।

সকালের রোদ হাসে
নতুন বছরের শুরুতে
বাংলার ঐতিহ্য
আছে সবার হৃদয়ে।

দশম শ্রেণি, যাত্রাবাড়ি আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

## গ্রীষ্মের আগমন

### মো. সাব্বির হোসেন

গ্রীষ্ম এলে প্রকৃতি করে
ফলের মিষ্টি আয়োজন
শুরু হয় প্রকৃতির দেওয়া
মিষ্টি ফলের ভোজন।

তরমুজ, বাঙ্গি, শসা
কত ফলের সমাহার
গরম হলেও সময় কাটে
আনন্দে সবার।

বাংলার ছয় ঋতু
সৃষ্টিকর্তার সেরা দান
গ্রীষ্ম এসে শোনায়
প্রকৃতির মিষ্টি সুরের গান।

অষ্টম শ্রেণি, ফেনী সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, ফেনী, চট্টগ্রাম

## নতুন বছর

### মো. তাজুল ইসলাম (তপন)

নতুন বছর এল
নিয়ে নতুন আশা
সবার মুখে লেগে আছে
আনন্দের ভাষা।

ভোরের সূর্য উঠল
রাঙা আলো ছড়িয়ে
সবাই মিলে এগিয়ে চলি
সুখের হাত বাড়িয়ে।

ঢাকের তালে তালে
নাচে ছেলে-মেয়ের দল
বৈশাখি মেলায় যাবে
আনন্দের কোলাহল।

শিক্ষার্থী, সপ্তম শ্রেণি, গৈলা মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আগৈলঝাড়া, বরিশাল

## নব বৈশাখের গান

### সুজিত হালদার

আজ এই প্রভাতে বাজিল প্রাণে
নব বৈশাখের নব গান
নাচিল ধমনি ফুল-ফল ঘ্রাণে
সকলি বাংলা মায়ের দান।

ভোরের আলোয় প্রাণ ছুঁয়ে যায়
নব চেতনার নববর্ষ
পান্তা-ইলিশ আম কাঁঠাল পায়
শত-সহস্র প্রাণের স্পর্শ।

আজ এই প্রভাতে ঊষার আলো
মেলিল দীপ্ত চোখের পাতা
মুছে দিয়ে জরা ক্লান্তি নিশি কালো
হরষিত মনেরও গাঁথা।

আয় খোকাখুকু আয় দলে দলে
বাংলার দামাল ছেলে-মেয়ে
আঁকি ছবি মধুর খেলার ছলে
সাধের বৈশাখি গান গেয়ে।

## বাংলার গ্রাম

### মো. সোহরাব হোসেন

সবুজে ঢাকা গ্রাম আমার
তুলনা যার নাই
পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে
পড়তে বসি সবাই।

কাঁচা রাস্তা চলে গেছে
দূরের নদী পাড়ে
শাপলা ফুল ফুটে থাকে
ঝিল, পুকুরের ধারে।

সন্ধ্যা হলে জোনাক জ্বলে
পথের ধারে ধারে
শিয়াল মামা গান করে
পূর্ণিমার রাত ভরে।

## লিখে চিঠি বৈশাখ

### কবির মাহমুদ

এই রোদ এই ঝড়, নীল রং আকাশে-
চারিদিকে ঘোর কালো
মেলে ডানা-পাখা-সে।

সবুজের সমারোহে, গাছপালা মুড়িয়ে-
ফুলপাখি জাগে সব
নবরং কুড়িয়ে।

গগনের গুড়গুড়ি, বিজলিরা চমকায়-
বাইরে যেতে মানা
ছাতা নিতে ধমকায়!

চৈত্রের মন কালো, বিদায়ের বিষাদে-
বৈশাখ লিখে চিঠি
বছরের হিস্যা দে!

গাছে গাছে আম-জাম, কাঁঠালের সু-ঘ্রাণে-
আনন্দে উৎফুল
সজীবের স্ব-প্রাণে।

চৈত্রের পানি-ভাতও, ইলিশের হর্ষে-
মেতে ওঠে বটতলা
প্রতি নববর্ষে!



# হামে শিশুর খাবার সচেতনতা

## পুষ্টিবিদ লিনা আকতার

হাম অত্যন্ত সংক্রামক এবং তীব্র ভাইরাসজনিত একটি রোগ, যা শিশুদের আক্রান্ত করে, তবে এটি যে-কোনো বয়সেই হতে পারে। হামের ভাইরাস শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ছড়ায় এবং এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শরীরে একটি স্বতন্ত্র ফুসকুড়ি দেখা দেয়। সাধারণত সংক্রমণের প্রায় ১৪ দিন পর উপসর্গগুলো দেখা দেয় এবং তারপর তা মাথা থেকে শরীরের নিচের অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ফুসকুড়ি দেখা দেওয়ার ৪ দিন আগে থেকে শুরু করে ৪ দিন পর পর্যন্ত আক্রান্ত ব্যক্তি সংক্রামক থাকে। যদিও বেশিরভাগ মানুষ কোনো গুরুতর জটিলতা ছাড়াই হাম থেকে সেরে ওঠে, তবে এটি কখনও কখনও মারাত্মক জটিলতার কারণ হতে পারে।

হাম হলে যেসব লক্ষণ দেখা দেয়- উচ্চ জ্বর, নাক দিয়ে পানি পড়া, কাশি, চোখ লাল হয়ে যাওয়া ও চোখ দিয়ে পানি পড়া, চ্যাপটা লাল দাগের মতো ফুসকুড়ি, যা একত্রিত হয়ে উঁচু হয়ে উঠতে পারে।

হাম থেকে দ্রুত সুস্থ হওয়ার জন্য সুষম খাবার এবং বিশ্রাম গুরুত্বপূর্ণ। নিচে অনুসরণ করার জন্য কিছু খাদ্যতালিকার নির্দেশিকা দেওয়া হলো:

প্রাথমিক পর্যায়ে কমলা ও লেবুর মতো ফলের রস দেওয়া যেতে পারে। কারণ তখন ক্ষুধামন্দা থাকে এবং এই ফলের রসগুলো খাবারে রুচি ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হয়।

ধীরে ধীরে রোগীকে সুষম ও পুষ্টিকর খাবার দেওয়া যেতে পারে। রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সক্রিয় করার জন্য প্রচুর পরিমাণে সবুজ শাকসবজি ও ফলমূল খেতে দিতে হবে।

পানিশূন্যতা রোধ করতে প্রচুর পরিমাণে পানি, ভেষজ চা, পানিজাতীয় ফল, শাকসবজি এবং স্যুপ দিতে হবে। তরল পানীয় শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে।

ভিটামিন এ সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি হামের তীব্রতা কমাতে সাহায্য করতে পারে। খাদ্যতালিকায় গাজর, মিষ্টি আলু, পালং শাক এবং ব্রকলি রাখা যেতে পারে।

শরীরের জন্য প্রোটিন অপরিহার্য। রোগীর খাবারে চর্বিহীন মাংস, মুরগি, মাছ, ডিম, দুগ্ধজাত পণ্য ,




ডাল, বাদাম এবং বিভিন্ন ধরনের বীজ মাঝে মাঝে রাখা যেতে পারে।

রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য জিঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি হামের স্থায়িত্ব কমাতে সাহায্য করে। খাদ্যতালিকায় ঝিনুক, লাল মাংস, মুরগির মাংস, শিম, বাদাম এবং গোটা শস্যের মতো খাবার দেওয়া যেতে পারে।

হাম থেকে সেরে ওঠার ক্ষেত্রে ভিটামিন সি-এর কোনো সরাসরি সংযোগের প্রমাণ না থাকলেও, এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় লেবু জাতীয় ফল, স্ট্রবেরি, ক্যাপসিকাম এবং কিউই-এর মতো খাবার রাখতে হবে।

### যে খাবারগুলো এড়িয়ে চলতে হবে

চিনিযুক্ত ও প্রক্রিয়াজাত খাবার রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল করে দিতে পারে এবং সুস্থ হতে বেশি সময় নিতে পারে।

অসুস্থ হলে পরিপাকতন্ত্র সাধারণত দুর্বল হয়ে যায়। তাই চর্বিযুক্ত ও ভাজা খাবার এড়িয়ে চলতে হবে।

ঝাল খাবার গলা ও মুখে অস্বস্তি সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে কাশি ও গলা ব্যথার মতো উপসর্গগুলো আরও বেড়ে যায়।

ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় এগুলো ডিহাইড্রেশনের কারণ হতে পারে ।

হামে আক্রান্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই আলাদা করে রাখতে হবে, কারণ এই রোগটি সংক্রামক। তাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া উচিত, যা রোগীকে দ্রুত সুস্থ করতে সাহায্য করবে।

রোগীকে সরাসরি সূর্যালোক থেকে দূরে রাখতে হবে, কারণ হাম চোখের কোষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

হাম বিশ্বের সবচেয়ে সংক্রামক রোগগুলোর মধ্যে একটি। এই রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয়, সঠিক যত্ন এবং টিকাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপযুক্ত যত্নের মাধ্যমে বেশিরভাগ মানুষ এক সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠে। ❑

*রাইয়ান হেলথ কেয়ার হসপিটাল এন্ড রিসার্চ সেন্টার, দিনাজপুর*



# আইসক্রিমের জন্মকথা

## সাঈদ বারী

আইসক্রিম খেতে ভালোবাসে না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন! বিশেষ করে ছোটোরা- তাদের হাতের মুঠোয় রঙিন, ঠান্ডা আর মিষ্টি আইসক্রিম দেখলে মুখে যে হাসি ফোটে, সেটাই হয়ত পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য। গরমের দিনে রোদে পুড়ে ক্লান্ত শরীরে এক চামচ আইসক্রিম মানে যেন ঠান্ডা বাতাসের ছোঁয়া। কিন্তু জানো কি, এই আইসক্রিমের গল্পটা অনেক পুরোনো! আজ আমরা জেনে নেব, কেমন করে জন্ম হয়েছিল এই মজার খাবারটির।

অনেক অনেক বছর আগে, আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে, চীন দেশে আইসক্রিমের মতো এক ধরনের খাবারের প্রচলন ছিল। ইতিহাস বলে, তখনকার চীনারা দুধ, চাল আর বরফ মিশিয়ে ঠান্ডা একটি মিষ্টান্ন তৈরি করত। সেটিই নাকি ছিল আধুনিক আইসক্রিমের প্রথম রূপ! ভাবো তো, তখন তো ফ্রিজ ছিল না! তাই তারা পাহাড় থেকে বরফ এনে তা সংরক্ষণ করত, আর সেই বরফ দিয়েই তৈরি করত এই ঠান্ডা মিষ্টান্ন।

এরপর আসি প্রাচীন রোমে। রোমান সম্রাট নিরো ছিলেন ঠান্ডা মিষ্টির বড়ো ভক্ত। বলা হয়, তিনি পাহাড় থেকে বরফ আনিয়ে তাতে ফলের রস, মধু ও ফুলের গন্ধ মিশিয়ে খেতেন। সেই সময়ের মানুষজনও বুঝতে শুরু করেছিল, ঠান্ডা খাবারের মধ্যে আছে এক বিশেষ আনন্দ- যা গরমের দিনে মনকে করে দেয় সতেজ।

আইসক্রিমের ইতিহাসে এরপর আসে আরব দেশের নাম। আরবরাই প্রথম দুধ, চিনি আর ফলের রস একসঙ্গে মিশিয়ে ঠান্ডা মিষ্টি তৈরি করতে শুরু করে। তাদের সেই 'শরবত' ধীরে ধীরে ইউরোপে পৌঁছে যায়। মধ্যযুগে যখন ইউরোপ ও পূর্বদেশের মধ্যে বাণিজ্য বাড়তে থাকে, তখন এই ঠান্ডা মিষ্টির খবরও ছড়িয়ে পড়ে নানা দেশে।

তবে আধুনিক আইসক্রিমের যাত্রা শুরু হয় ইতালিতে। ১৬শ শতকে এক ইতালীয় রাঁধুনি বার্নার্দো বুন্তালেন্টি প্রথম দুধ, ডিম, চিনি ও বরফ মিশিয়ে এমন এক

মিষ্টি তৈরি করেন, যা দেখতে ও খেতে একদম আজকের আইসক্রিমের মতো। এরপর ফ্রান্সে রাজা লুই চতুর্দশের রান্নাঘরে আইসক্রিম জায়গা করে নেয় রাজকীয় মেনুতে। তখন কিন্তু সাধারণ মানুষ আইসক্রিম খেতে পেত না- এটা ছিল রাজা-রানি আর ধনী ব্যক্তিদের খাবার!

১৭শ ও ১৮শ শতকে যখন ইউরোপে ঠান্ডা রাখার প্রযুক্তি একটু সহজ হয়, তখন আইসক্রিম ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের মাঝেও।

১৭৭০ সালে ইতালীয় অভিবাসীরা আমেরিকায় আইসক্রিম নিয়ে যায়, আর সেখান থেকেই শুরু হয় এর বিশ্বজোড়া জনপ্রিয়তা।



একসময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন ও থমাস জেফারসন পর্যন্ত আইসক্রিমের ভক্ত হয়ে পড়েন! জেফারসনের হাতে লেখা আইসক্রিমের একটি রেসিপি এখনো সংরক্ষিত আছে জাদুঘরে।

তারপর আসে ১৯শ শতক, যখন মানুষ তৈরি করতে শেখে 'আইসক্রিম মেশিন'। এই মেশিনে সহজেই দুধ ও ক্রিম জমিয়ে আইসক্রিম বানানো যেত। ১৯০৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'সেন্ট লুইস বিশ্বমেলা'-য় প্রথমবারের মতো বিক্রি হয় আইসক্রিম কোন- মানে, রুটি বা ওয়েফারের তৈরি কোণের মধ্যে আইসক্রিম পরিবেশন। তারপর থেকে আইসক্রিম হয়ে ওঠে সত্যিকারের জনপ্রিয় খাবার। আজ আইসক্রিমে কী নেই! চকলেট, ভ্যানিলা, স্ট্রবেরি, আম, কলা, পেস্তা, এমনকি কালো তিলের আইসক্রিমও হয়! কারও পছন্দ নরম 'সফট সার্ভ', কেউ আবার চায় শক্ত জমাট বলের মতো স্কুপ।

এখন তো আইসক্রিম শুধু খাবার নয়, আনন্দের প্রতীকও বটে। জন্মদিনের পার্টি হোক, রোদে পুড়ে ঘাম ঝরার পর হোক- এক স্কুপ আইসক্রিম যেন মুছে দেয় সব ক্লান্তি। বিজ্ঞানীরাও বলেন, ঠান্ডা মিষ্টি খেলে মস্তিষ্কে ডোপামিন নামের এক রাসায়নিক তৈরি হয়, যা আমাদের মনে আনে খুশি। তাই তো আইসক্রিম খেলে মনটা এমন আনন্দে ভরে ওঠে!

তবে মনে রাখবে, অতিরিক্ত আইসক্রিম খাওয়া ঠিক নয়। বেশি ঠান্ডা খাবার গলা ব্যথা করতে পারে, আর চিনি বেশি খেলে দাঁতের ক্ষতি হয়। তাই মজা করে, কিন্তু নির্দিষ্ট পরিমানে আইসক্রিম খাওয়া সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

তাহলে এবার যখন তুমি আইসক্রিম হাতে নেবে, একটু ভেবে দেখো- এই এক স্কুপ ঠান্ডা মিষ্টির পেছনে লুকিয়ে আছে হাজার বছরের ইতিহাস! চীনের পাহাড় থেকে শুরু করে রোমান রাজপ্রাসাদ, তারপর ইতালি, ফ্রান্স হয়ে আমেরিকা- দীর্ঘ এক অভিযাত্রার পর আজ আমাদের মুখে ঠান্ডা সুখের এই স্বাদ। আইসক্রিম শুধু একটি খাবার নয়, এটি ইতিহাস, বিজ্ঞান আর আনন্দের এক মিশ্রণ- একটা জমে ওঠা গল্প! ❑

---

প্রকাশক ও প্রধান নির্বাহী



# বই হোক আমাদের বন্ধু

**মেজবাউল হক**

প্রতি বছর ২৩শে এপ্রিল বিশ্বজুড়ে পালিত হয় World Book and Copyright Day বা বিশ্ব গ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ত্ব দিবস। বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা, লেখক ও প্রকাশকদের সম্মান জানানো এবং জ্ঞানচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরতেই এই দিবস পালন করা হয়। বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ার সাথে সাথে বই পড়ার অভ্যাস অনেক শিশুর মধ্যেই কমে যাচ্ছে। তাই ছোটোদের বইয়ের প্রতি আগ্রহ তৈরি করা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

বই মানুষের জ্ঞান ও সভ্যতার অন্যতম ভিত্তি। একটি বই একজন মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে। তাই ছোটোদের বইয়ের প্রতি আগ্রহ তৈরি করা মানে একটি সুন্দর ও সচেতন প্রজন্ম গড়ে তোলা। পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজ সবাই মিলে যদি শিশুদের বই পড়তে উৎসাহ দেয়, তাহলে তারা প্রযুক্তির অপব্যবহার থেকে দূরে থেকে জ্ঞান ও সৃজনশীলতার পথে এগিয়ে যাবে।

বই মানুষের সবচেয়ে ভালো বন্ধু। একটি ভালো বই শিশুর মনকে আনন্দ দেয়, নতুন কিছু শেখায় এবং কল্পনার জগতকে বিস্তৃত করে। ছোটোবেলা থেকেই যারা বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলে, তারা সাধারণত চিন্তাশীল, সৃজনশীল ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। বই শুধু পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য নয়, বরং একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতেও সাহায্য করে।

ছোটোদের উপযোগী বই নির্বাচন করাও খুব জরুরি। শিশুদের বয়স ও মানসিকতার সঙ্গে মিল রেখে রঙিন ছবি, সহজ ভাষা এবং মজার গল্পের বই দিলে তারা সহজেই আকৃষ্ট হয়। রূপকথা, মুক্তিযুদ্ধের গল্প, বিজ্ঞানভিত্তিক বই, ছড়া ও কমিক্স শিশুদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। বইয়ের বিষয়বস্তু যদি আনন্দদায়ক ও শিক্ষণীয় হয়, তাহলে শিশুরা আগ্রহ নিয়ে বই পড়ে।

বর্তমান সময়ে ছোটোদের বেশিরভাগ সময় কাটে মোবাইল ফোন, টেলিভিশন কিংবা ভিডিও গেম নিয়ে। এতে তারা বিনোদন পেলেও ধীরে ধীরে

বই থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অথচ বই এমন একটি মাধ্যম, যা শিশুর ভাষাজ্ঞান বাড়ায়, কল্পনাশক্তি উন্নত করে এবং মনোযোগ বৃদ্ধি করে। গল্পের বই পড়তে পড়তে শিশুরা নতুন নতুন চরিত্র, ঘটনা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারে। এতে তাদের মনের জগৎ আরও সমৃদ্ধ হয়।

ছোটোদের বইয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর জন্য পরিবারকে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করতে হবে। শিশুরা বড়োদের দেখেই অনেক কিছু শেখে। বাবা-মা যদি নিজেরা বই পড়েন এবং সন্তানকে বই পড়তে উৎসাহ দেন, তাহলে শিশুর মধ্যেও বইয়ের প্রতি ভালোবাসা জন্মাবে। ছোটোবেলায় ঘুমানোর আগে গল্প শোনানো বা একসঙ্গে বই পড়ার অভ্যাস শিশুর মনে বইয়ের প্রতি আকর্ষণ তৈরি করে।

বিদ্যালয়ও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। স্কুলে নিয়মিত পাঠাগার কার্যক্রম, গল্প বলা প্রতিযোগিতা, বইমেলা কিংবা বই আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে শিশুদের বই পড়ার আগ্রহ বাড়ে। শিক্ষকরা যদি পাঠ্য বইয়ের বাইরেও গল্প, কবিতা কিংবা বিজ্ঞানভিত্তিক বই পড়তে উৎসাহ দেন, তাহলে শিশুরা আনন্দের সঙ্গে বই পড়বে।

বর্তমানে অনলাইন ও ডিজিটাল মাধ্যমেও শিশুদের জন্য অনেক বই পাওয়া যায়। তবে শুধু মোবাইল বা ট্যাবের ওপর নির্ভর না করে ছাপানো বই পড়ার অভ্যাসও গড়ে তুলতে হবে। হাতে বই নিয়ে পড়ার মধ্যে আলাদা এক আনন্দ রয়েছে। বইয়ের পাতা উলটে গল্পের ভেতর হারিয়ে যাওয়ার অনুভূতি শিশুর মনকে আরও বেশি আনন্দ দেয়।

সবশেষে বলা যায়, বই হলো আলোর পথপ্রদর্শক। ছোটোদের হাতে যদি ভালো বই তুলে দেওয়া যায়, তবে তারা ভবিষ্যতে দেশ ও সমাজের জন্য যোগ্য নাগরিক হয়ে উঠবে। বিশ্ব গ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ত্ব দিবসে আমাদের অঙ্গীকার হবে- প্রতিটি শিশুর হাতে বই পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের বই পড়ার আনন্দের অনুভূতি জাগিয়ে তোলা। তাহলেই গড়ে উঠবে জ্ঞানভিত্তিক, মানবিক ও সুন্দর একটি সমাজ।

# রাজরানি বৈশাখ

## রকিবুল ইসলাম

ঢ্যাম কুড়কুড়, ঢ্যাম কুড়কুড়, ঢ্যাম–
পটকা ফোটে, পটকা ফোটে, পটকা নাকি ড্যাম!

তাক দুমাদুম, তাক দুমাদুম, তাক–
রং মেখে আজ হাজির হলো রাজরানি বৈশাখ।
ছুটল বাতাস বীরের বেশে
ঘরবাড়ি আর বাজার ঘেঁষে।
বিজলি-বাতি উঠল জ্বলে কড় কড়কড়াৎ–
বিকেলবেলা সূর্য ডুবে নামল বুঝি রাত।

তাক দুমাদুম, তাক দুমাদুম, তাক–
নদীর তীরে বসল মেলা, বাজল বাঁশি ঢাক।
ছুটল খোকন দাদুর সাথে
মেলায় গিয়ে খেলায় মাতে।
আমকড়ালি জামকড়ালি কাঁপছে বাগান-ঘর–
ওই এল রে, ওই এল রে কালবোশেখি ঝড়।





# পাহাড়ে বর্ষবরণ

## জুবায়ের রানা

বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখে বাঙালির প্রাণের উৎসব পালিত হয়। নানা আয়োজনে দিনটি উদযাপন করে বাংলা ভাষাভাষি মানুষ। তবে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনপদে বছর ঘুরে আসে এক বর্ণিল উৎসবের ঋতু হয়ে। চৈত্রের শেষ দুই দিন ও বৈশাখের প্রথম দিন জুড়ে আয়োজিত হয় এক উৎসব। এই উৎসবকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় বৈসাবি, যা তিনটি আলাদা জাতিগোষ্ঠীর তিনটি আলাদা নামের উৎসবের সমন্বয়। নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়া, পুরনোকে বিদায় জানানো এবং প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার এক অনন্য আয়োজন এটি।

এ বর্ষবরণ উৎসবকে চাকমারা 'বিজু', মারমারা 'সাংগ্রাই' এবং ত্রিপুরারা 'বৈসু' বলে অভিহিত করলেও পুরো পার্বত্য জেলায় তা 'বৈসাবি' নামেই পরিচিত। বছরের শেষ দুই দিন এবং নতুন বছরের প্রথম দিনসহ মোট তিন দিন মূলত বর্ষবরণ উৎসব 'বৈসাবি' পালিত হয় বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি- এই তিন পার্বত্য জেলায়। বৈসাবি শব্দটির প্রথম অক্ষর 'বৈ' দিয়ে। বৈ + সা + বি = বৈসাবি অর্থাৎ 'বৈ' মানে 'বৈসু', এটি ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের ভাষা। 'সা' মানে 'সাংগ্রাই', এটি মারমা সম্প্রদায়ের ভাষা। 'বি' মানে বিজু, এটি চাকমা

সম্প্রদায়ের ভাষা। সুতরাং বছরের প্রথম দিনকে ত্রিপুরা সম্প্রদায় 'বৈজু', মারমা সম্প্রদায় 'সাংগ্রাই' এবং চাকমা সম্প্রদায় 'বিজু' নামে অভিহিত করে থাকে। তিন সম্প্রদায়ের উৎসবের আদ্য অক্ষর দিয়ে গঠিত হয়েছে 'বৈসাবি'।

পাহাড়ে এই উৎসবের সঙ্গে গভীরভাবে মিশে আছে একটি ফুল, যেটিকে এক নামে সবাই জানে 'বিজু ফুল' হিসেবে। এটি রুবিয়েসি গোত্রের একটি ফুল। পাহাড়ের নানা সম্প্রদায়ের কাছে এই ফুল আলাদা আলাদা নামে পরিচিত। চাকমাদের কাছে এটি 'ভাতজোড়া', ত্রিপুরাদের কাছে 'কুমুইবোবা', মারমাদের কাছে 'চাইগ্রাইটং' আর সাঁওতালদের কাছে 'পাতাবাহা' নামে পরিচিত বিশেষ এই ফুলটি।

সাধারণত চৈত্র মাসের শুরুর দিকে পাহাড়ে দেখা মেলে বিজু ফুলের। পাহাড়ের নানা জায়গায় এই ফুলের দেখা মিললেই বুঝতে হবে নতুন বর্ষ আর বৈসাবি উৎসব তার আগমনী বার্তা দিচ্ছে। বৈসাবি উৎসবের প্রথম দিন খুব সকালে জঙ্গল থেকে ছেলে মেয়েরা বিজু ফুল সংগ্রহ করে তা দিয়ে মালা গেঁথে ঘরের মূল দরজা সাজায়। পাশাপাশি এই ফুলের সঙ্গে অন্যান্য ফুল মিশিয়ে কলাপাতায় নিয়ে নদীর বালুচর বা বাড়ির আশপাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছড়াতে প্রার্থনায় বসেন পাহাড়ি সম্প্রদায়ের মানুষ।

উপজাতিদের ধারণা অনুযায়ী চৈত্র মাসের শুরুতেই একটি পাখি এসে বিজু বলে ডাক দিয়ে যায়। চাকমা সম্প্রদায় এ পাখিকে বিজু পেইক (বিজু পাখি) বলে। এই পাখির সুমধুর কলতানে বিজু বা চৈত্রসংক্রান্তি উৎসবের আগমনী বার্তা নিয়ে আসে।

ত্রিপুরা, মারমা এবং চাকমা জনগোষ্ঠীর এই উৎসবগুলোর নাম ও কিছু আচার-অনুষ্ঠানের ভিন্নতা থাকলেও মূলত একই অর্থ বহন করে। পুরনো বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরকে আনন্দ, শুদ্ধতা ও কৃতজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বরণ করে নেওয়া। এই উৎসব বহু প্রাচীন এবং এটি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সৌরবর্ষভিত্তিক নববর্ষ উদ্‌যাপনের ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। পার্বত্য এলাকার মানুষের জীবনধারা সাধারণত প্রকৃতি ও কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তাই ঋতু পরিবর্তনের এই সময়টি তাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

চৈত্র সংক্রান্তির শেষ দুইদিন ও বাংলা নবর্ষের প্রথম দিন বৈসু উৎসবে মেতে ওঠে ত্রিপুরা সম্প্রদায়। চাকমারাও বিজু উৎসব পালন করে চৈত্র সংক্রান্তির শেষ দিন থেকে ১লা বৈশাখ পর্যন্ত। চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে মারমা সম্প্রদায়ের সাংগ্রাইং উৎসব শুরু হয়। এছাড়া বিজু উৎসব পালন করেন চাকমা সম্প্রদায়।

চাকমারা প্রথম দিনে নদীতে ফুল ভাসিয়ে দিয়ে উৎসব শুরু করে। এটিকে বলে 'ফুল বিঝু'। দ্বিতীয় দিন হলো 'মূল বিঝু'। এদিন সকালে আদিবাসী শিশুরা গৃহপালিত মোরগ-মুরগি ও হাঁসদের খাবার দেয়। দুপুর থেকেই প্রতিটি ঘরে নানা রকম সবজি দিয়ে রান্না করা খাবার পরিবেশন করা হয়। এ খাবারটিকে বলা হয় 'পাচন'। আর উৎসবের শেষ দিন অর্থাৎ বাংলা নববর্ষের দিনটিকে বলা হয় 'গজ্যাপজ্যা দিন'। এদিন চাকমারা সবাই আরাম আয়েশে দিনটি কাটায়।

একইভাবে ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠীরাও উৎসব পালন করে থাকে। তবে উৎসবটি ত্রিপুরাদের ভাষায় প্রথম দিনটিকে 'হারি বৈসু' দ্বিতীয় দিনটিকে 'বিসিকাঠাল' ও বছরের প্রথম দিনটাকে 'বৈসুমা' বলে।

মারমা জাতিগোষ্ঠীর ভাষায় প্রথম দিন 'সাংগ্রাই', দ্বিতীয় দিন 'আক্য' ও বছরের প্রথম দিনটিকে 'আতাদা' বলা হয়।

পাহাড়িদের সাথে সাথে বাঙালিরাও এ উৎসবে সামিল হন নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে। নামে ভিন্নতা থাকলেও উৎসবের রং থাকে একই। এ উৎসবকে কেন্দ্র করে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিণত হয় সব সম্প্রদায়ের মানুষের মিলন মেলায়। এ উৎসব দেখতে পাহাড়ে বেড়ে যায় পর্যটকের সংখ্যা।❑

---

প্রাবন্ধিক

# নৌকা বাইচ

## রফিকুল ইসলাম বাবু

'আল্লাহ-রসুলের নাম লইয়া নাও খোলোরে/ সোনার নায়ে পবনের বৈঠা ধর রে/ হেইয়্যাবোল-হেইয়্যাবোল।' গানের তালে তালে নৌকা বাইচ করছেন মাঝি-মাল্লারা। বাংলার অতি পরিচিত একটি দৃশ্য। একবিংশ শতাব্দীতে খুব বেশি চোখে না পড়লেও নব্বই দশকের এক উৎসবের নাম ছিল নৌকা বাইচ। যা বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য। একসময় নদীমাতৃক এ দেশের নৌকা বাইচ ছিল নদীপাড়ের মানুষের প্রধান উৎসব। নৌকা বাইচ হলো নদীতে নৌকা চালনার প্রতিযোগিতা। যা দাঁড় টানার কসরত ও নৌকা চালনার কৌশল দিয়ে আমাদের বিনোদন দেয়। একদল মাঝি নিয়ে একেকটি দল গঠিত হয়। এমন অনেকগুলো দলের মধ্যে নৌকা চালনা প্রতিযোগিতাই হলো নৌকা বাইচ।

**ইতিহাস :** নৌকা বাইচ এর সঠিক ইতিহাস আজও জানা যায়নি। বাইচ শব্দটি ফার্সি। এর অর্থ হলো বাজি/ বাইজ/ বাইচ/প্রতিযোগিতা/ খেলা। কালের পরিক্রমায় 'মেসোপটেমিয়ার' মানুষের শুরু করা নৌকা বাইচ খেলা আমাদের দেশেও চলে আসে । যা খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ বছর আগে 'মেসোপটেমিয়ার' লোকেরা ইউফ্রেটিস নদীতে এরকম নৌকা বাইচের আয়োজন করত। এরপর মিশরের নীলনদ এবং ১৯০০ সাল থেকে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ছড়িয়ে পড়ে। 'বাইচ' শব্দটির উৎপত্তি বিবেচনা করে মধ্য যুগের মুসলমান নবাব, সুবেদার, ভূস্বামীরা যাদের নৌবাহিনী ছিল তারা বিভিন্ন নৌযানের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করে। তবে দুটি জনশ্রুতি আছে–

১. জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে স্নানার্থীদের নিয়ে বহু নৌকা এক সাথে মাঝিরা নদী পারাপারে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেয় । এ থেকেও নৌকা বাইচের শুরু জনশ্রুতি আছে।

২. পীর গাজীকে কেন্দ্র করে আঠারো শতকের শুরুর দিকে মেঘনা নদীর এক পাড়ে দাঁড়িয়ে অন্য পাড়ে থাকা ভক্তদের কাছে আসার আহ্বান করেন। কিন্তু ঘাটে কোনো নৌকা ছিল না। ভক্তরা তার কাছে আসতে একটি ডিঙ্গি নৌকা খুঁজে বের করেন। যখনই নৌকাটি মাঝ নদীতে এল তখনই নদী ফুলে ফেঁপে উঠল। ওই সময় চারপাশের যত নৌকা ছিল তারাও খবর পেয়ে নৌকা নিয়ে ছুটে আসেন। তখন সারি সারি নৌকা একে অন্যের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলে। এ থেকেই নৌকা বাইচের গোড়াপত্তন।

**গঠন ও নাম:** নৌকা বাইচের নৌকা হয় সরু এবং লম্বাটে । কারণ সরু ও লম্বাটে নৌকা নদীর পানি কেটে দ্রুত গতিতে চলতে পারে। নৌকার সামনে সুন্দর করে সাজানো হয়। কখনো ময়ূরের মুখ , কখনো



রাজহাঁসের মুখ বা পাখির ঠোঁটের অবয়ব তৈরি করে নৌকা বানানো হয়ে থাকে। এতে অতি উজ্জ্বল রং করে ফুল, লতা, পাতা আরো অনেক রকম জিনিস এঁকে দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করে থাকেন। সিলেট অঞ্চলে সারেঙ্গি নৌকা ব্যবহার করা হয়। এর আকার কোষা ও ছিপ জাতীয় বাইচের নৌকার মতোই সরু, লম্বায় ১৫০-২০০ ফুট এবং প্রস্থ প্রায় ৫-৬ ফুট হয়। নৌকা তৈরিতে সাধারণত শাল, শীল কড়ই, গর্জন ও জারুল কাঠ ব্যবহার করা হয়। নৌকাগুলোর নামও রাখা হয় ভিন্ন ভিন্ন। যেমন- সোনার তরি, পঙ্খিরাজ, ময়ূরপঙ্খি অগ্রদূত, ঝড়ের পাখি, সাইমুন, তুফানমেল, সোনার তরি, দ্বীপরাজ ইত্যাদি।

**নৌকা বাইচের নিয়ম :** নৌকা বাইচের আগে মাঝিরা পবিত্র হয়ে বা গোসল করে নতুন গেঞ্জি আর মাথায় গামছা পরে নৌকায় উঠে। তাদের কারো কারো হাতে থাকে কাঁসর, করতাল, ঢোল, ডপকি। সবার মাঝখানে থাকেন নৌকার নির্দেশক। প্রতিটি নৌকায় ৭/ ২৫/ ৫০/ ১০০ জন মাঝি থাকতে পারেন। নৌকার দুই পাশে মাঝিরা সারি বেঁধে বসে পড়েন বৈঠা হাতে নিয়ে। একজন নৌকা পরিচালনা করার জন্য থাকেন তাকে গায়েন বলা হয়। তিনি বসে থাকেন নৌকার গলুইয়ে। মাঝিরা একত্রে নৌকা জয়ধ্বনি করে ছাড়ার সাথে সাথে সমবেত স্বরে গান ধরে থাকেন এবং ঝুঁকে ঝুঁকে বৈঠা টানতে থাকেন আর সেই সাথে নৌকাও এগিয়ে যেতে থাকে। সবার নৌকা যখন ছুটতে থাকে তখন প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কার আগে কে যেতে পারে। সমস্বরে ঝোঁক তুলে গাইতে থাকে হৈ হৈ হৈয়া হৈ হৈয়া। নৌকার গতিও বেড়ে যায় অনেক। নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় দূরত্ব হয় ৬৫০ মি.। এক নৌকা থেকে আরেক নৌকার দূরত্ব থাকে ১০ মি.। নৌকা বাইচের প্রাণ হলো সারিগান। নৌকা চালানোর সময় তাল ঠিক রাখতে এবং মাঝিদের মনে উদ্দীপনা জোগাতে গায়ক দলের গাওয়া এই গানগুলো বাংলা লোকসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

বাংলার লোকজ সংস্কৃতির নানা ঐতিহ্য আজ বিলুপ্তপ্রায়। সেই সাথে হারিয়ে যাচ্ছে নদী পাড়ের মানুষের ব্যাপক আনন্দ, উৎসাহ, উদ্দীপনার উৎসব নৌকা বাইচ। শিশু-কিশোর থেকে বয়োবৃদ্ধ ও হাজার হাজার মানুষের আবেগ-উত্তেজনার মুহুর্মুহু কলধ্বনি। ছিল মনোমুগ্ধকর নির্মল আনন্দের খোরাক। বাংলাদেশের নদীগুলো নাব্যতা হারাচ্ছে। নদী দখল, নদী দূষণ, নাব্যতা কমে যাওয়া ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতার কারণে নৌকা বাইচ তার জৌলুস হারাচ্ছে। বর্তমানে শিশুদের কাছে নৌকা বাইচ যেন রূপকথার গল্প। এভাবেই প্রায় বিলুপ্তির পথে নৌকা বাইচ। ❑

---

প্রাবন্ধিক





# জানালাবিহীন বিদ্যালয়

সবাই সূর্যালোকের প্রবেশের জন্য জানালা খুলে দেওয়ার কথা বললেও কিন্তু টাঙ্গাইলের সন্তোষে জাহ্নবী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতারা উলটো পথেই হেঁটেছেন। ১৮৭০ সালে ৪.৫ একর জায়গায় টাঙ্গাইলের সন্তোষ ছয়-আনির জমিদার শ্রীমতি জাহ্নবী চৌধুরানি শিক্ষার প্রসারে স্থাপন করেন সন্তোষ জাহ্নবী বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের একতলা ভবনটিতে সংকীর্ণ জানালার পরিবর্তে তৈরি করা হয়েছিল অনেকগুলো দরজা। ভেবেছিল এখানে জ্ঞানের আলো আর সূর্যের আলো দুটোই প্রবেশ করবে দরজা দিয়ে। ভবনের ভেতরে প্রচুর আলো-বাতাসে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করতে পারে সেজন্যেই প্রতিষ্ঠাতারা স্কুলে সংকীর্ণ জানালার পরিবর্তে ১০১টি দরজা রেখেছিলেন। তবে এখন অনেকগুলো দরজা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রায় ৩শ' ফুট দীর্ঘ ২০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট স্কুল অট্টালিকাটি চুন সুরকীর ২৪ ইঞ্চি দেয়ালে ঘেরা। মেঝে থেকে ছাদের উচ্চতা প্রায় ২২ ফুট। আগে অবশ্য আরো দুই ফুট উচ্চতা বেশি ছিল। পরবর্তী সময়ে ছাদ পুনঃনির্মাণের সময় উচ্চতা দুই ফুট কমিয়ে দেওয়া হয়। একটিও জানালা নেই বিদ্যালয়টির অথচ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান্তরালভাবে স্থাপিত ১০১ টি দরজার এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে যে-কোনো দরজা দিয়ে বের হওয়া যায়। এর সম্মুখভাগে রয়েছে বিশাল সাইজের মোট ২৪টি দরজা । পেছন দিকেও রয়েছে প্রায় সমসংখ্যক দরজা। দশটি শ্রেণিকক্ষের প্রতিটির ভেতরে আবার তিন থেকে চারটি করে দরজা রয়েছে। এসব দরজা দিয়ে একটি কক্ষ থেকে আরেকটি কক্ষে যাতায়াত করা যায়। অর্থাৎ ভবনের পূর্ব প্রান্তের শেষ কক্ষটির ভেতর দিয়ে পশ্চিম প্রান্তের শেষ কক্ষটিতে যাওয়া সম্ভব। ভবনের সামনে যে বিশাল দিঘি রয়েছে তার বয়সও একই সমান।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় দ্বিতীয় এবং টাঙ্গাইল জেলার সর্বপ্রাচীন বিদ্যাপীঠ বিদ্যালয়টিতে ১৫৫ বছর ধরে সুনামের সাথে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। শতাব্দীর আরো সাক্ষ্য দিচ্ছে স্কুলের সামনের সূর্যঘড়িটি। যা এ উপমহাদেশে দ্বিতীয়টি নেই। ঘড়িটি বর্তমানেও সচল অবস্থায় আছে।

প্রতিবেদন : রাইসা তাবাসসুম



# এশিয়ান গেমস হকিতে বাংলাদেশের মেয়েরা

প্রথমবারের মতো এশিয়ান গেমস হকিতে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশের মেয়েরা। হংকং চায়নাকে হারিয়ে মূল পর্বের টিকিট নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ নারী হকি দল। ২৬শে এপ্রিল জাকার্তায় এশিয়ান গেমস হকির বাছাইপর্বে হংকং চায়নাকে ২-১ গোলে হারায় বাংলাদেশের মেয়েরা।

চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে জাপানের আইচই নাগোয়াতে বসবে এশিয়ান গেমসের আসর। ১৯৭৮ সাল থেকেই এশিয়ান গেমসের এই আসরে বাংলাদেশ অংশ নিচ্ছে। পুরুষ হকিতে শুরু থেকেই বাংলাদেশ খেললেও এবারই প্রথম এশিয়ান গেমসের নারী হকি ইভেন্টে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

বাছাই পর্বে 'এ' গ্রুপে থাকা বাংলাদেশ নিজেদের গ্রুপের শীর্ষ দুই দলের একটি হিসেবে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে, সেইসঙ্গে নিশ্চিত করেছে আগামী সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া টুর্নামেন্টের টিকিটও। এশিয়ান হকি ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের তথ্য অনুযায়ী, বাছাই পর্ব থেকে ৪টি দল এশিয়ান গেমসে খেলার সুযোগ পাবে।

বাছাই পর্বে প্রথম দুই ম্যাচে ৪ পয়েন্ট পাওয়ায় হংকং চায়নার বিপক্ষে এই ম্যাচের আগে সুবিধাজনক অবস্থানেই ছিল বাংলাদেশ। ম্যাচটি ড্র করতে পারলেই গ্রুপে রানার্সআপ হওয়া নিশ্চিত ছিল। কিন্তু অর্পিতা পালরা জয় দিয়েই ইতিহাস গড়েছে।

তিন ম্যাচ শেষে বাংলাদেশের সংগ্রহ ৭ পয়েন্ট। গ্রুপের শেষ ম্যাচে চাইনিজ তাইপে উজবেকিস্তানকে হারাতে পারলে তাদেরও সমান পয়েন্ট হবে।

মেয়েদের সিনিয়র পর্যায়ের হকির কোনো প্রতিযোগিতায় এবারই প্রথম অংশ নিয়েছিল বাংলাদেশ, আর প্রথমবারেই বাজিমাত। বিকেএসপির মেয়েদের নিয়ে গড়া দলটি প্রথম ম্যাচে চাইনিজ তাইপের সঙ্গে দারুণ লড়াই করে ৫-৫ গোলে ড্র করে। পরের ম্যাচে উজবেকিস্তানকে ২-১ গোলে হারিয়ে স্বপ্নপূরণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। এরপর ২৬ এপ্রিল হংকংকে হারিয়ে এশিয়ান গেমস্ হকির মূলপর্বে জায়গা নিশ্চিত করল লাল- সবুজের মেয়েরা।

এশিয়ান গেমসের বাছাই পর্বের এই টুর্নামেন্ট খেলার আগে অবশ্য বাংলাদেশের এই মেয়েরা বিদেশে বয়স ভিত্তিক টুর্নামেন্ট খেলেছে। ২০২১ সালে সিঙ্গাপুরে এএইচএফ অ-২১ টুর্নামেন্টই বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। এরপর ওমানে ফাইভ-এ সাইড টুর্নামেন্ট খেলেছে বাংলাদেশ। গত বছর এএইচএফ অ-১৮ টুর্নামেন্টে প্রথমবার অংশ নিয়েই ব্রোঞ্জ পদক পায়।

১৯৭৮-৭৯ সালেও নারী হকি দল ছিল। সেই সময় ঢাকায় একটি প্রীতি ম্যাচ খেলার রেকর্ড পাওয়া যায়। নাছিমা নাহার পুতুলসহ আরো কয়েকজন নারী সেই দলে খেলেছিলেন।

অর্পিতারা বাংলাদেশের নারী হকিতে ইতিহাস করেছেন। তাদের এই সাফল্যে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন ফেডারেশনের কর্মকর্তাগণ। সামনে নারী হকি নিয়ে আরো টুর্নামেন্ট, ক্যাম্প, আম্পায়ারিং-কোচিং প্রোগ্রাম করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা



# বর্ষবরণ

## আয়ামান সিদ্দিকা

পান্তাভাতে শুরু হয়
বর্ষবরণের সূচনা
সবার মনে জাগে
নতুন আত্মশক্তির প্রেরণা।

পুরোনো সব কষ্ট ভুলে
শুরু করি নতুন দিন
সত্য আর ন্যায়ের পথে
থাকব সবাই চিরদিন।

বাংলা নববর্ষ
আনে মিলনের ডাক
সুখে-শান্তিতে ভরে উঠুক
আনন্দের এই বৈশাখ।

দ্বাদশ শ্রেণি, সিদ্ধেশ্বরী গালর্স কলেজ, ঢাকা

# আমাদের সুন্দর পৃথিবী

## সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

নীল আকাশ, সবুজ গাছপালা, পাখির গান আর কলকল করে বয়ে চলা নদী - সব মিলিয়ে আমাদের এই পৃথিবীটা কত সুন্দর, তাই না? এই ভালোবাসার পৃথিবীকে ভালো রাখার জন্য প্রতি বছর ২২শে এপ্রিল বিশ্বজুড়ে পালিত হয় 'বিশ্ব ধরিত্রী দিবস'। 'ধরিত্রী' মানে হলো আমাদের এই পৃথিবী বা ধরণী। আমাদের নিজেদের বাড়িটা যেমন আমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখি, তেমনি আমাদের এই পৃথিবীটাকেও কিন্তু যত্নে রাখতে হবে। চলো কিছু উপায় জেনে নিই, কীভাবে আমরা আমাদের এই পৃথিবীকে বাঁচাতে পারি।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, আমাদের পৃথিবীটা দিন দিন একটু একটু করে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। আমরা প্লাস্টিকের বোতল-প্যাকেট যেখানে-সেখানে ফেলছি, নদী-পুকুরের পানি নোংরা করছি আর নির্বিচারে গাছ কেটে ফেলছি। এর ফলে গরম বেড়ে যাচ্ছে, বরফ গলে যাচ্ছে আর পশুপাখিরা তাদের ঘর হারাচ্ছে। তবে মন খারাপের কিছু নেই, আমরা সকলে মিলেই কিন্তু পারি আমাদের প্রিয় পৃথিবীকে আবার হাসিখুশি করে তুলতে!

এই ধরিত্রী দিবসে চলো বন্ধুরা আমরা সবাই মিলে ৫টি সহজ প্রতিজ্ঞা করি, যা আমাদের পৃথিবীকে এক সময় হয়ত বদলে দেবে:

১. **প্লাস্টিককে 'না' বলি:** চিপসের প্যাকেট, চকলেট বা আইসক্রিমের কাঠি এবং প্লাস্টিকের বোতলের পানীয় খাওয়ার পর কখনোই রাস্তায়, ড্রেনে বা মাঠে ফেলব না। কারণ, এগুলো মাটির সাথে মেশে না এবং মাটিকে নষ্ট করে। কাজেই আমরা সব সময় নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে ময়লা ফেলব।



২. **গাছ হবে সেরা বন্ধুঃ** বছরে অন্তত একটি করে হলেও গাছের চারা লাগাবো এবং সেটিতে নিয়মিত পানি দেবো। মনে রেখো, গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়, ফুল-ফল দেয় আর চারপাশ ঠান্ডা রাখে।

৩. **পানি অপচয় করব নাঃ** ব্রাশ করা বা সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার সময় অনেকেই কল ছেড়ে রাখি। আজ থেকে পানি ব্যবহারের ঠিক পরপরই কল ভালো করে বন্ধ করব। এক ফোঁটা পানিও যেন নষ্ট না হয়।

৪. **বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবঃ** যখন ঘর থেকে বের হবো তখন ফ্যান, লাইট বা টিভির সুইচ বন্ধ করতে ভুলব না। বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা মানেই পৃথিবীর জ্বালানি বাঁচানো।

৫. **কাগজ বাঁচাও-বন বাঁচাওঃ** আমাদের লেখার খাতার পাতাগুলো কিন্তু গাছ কেটেই তৈরি হয়! তাই খাতার পাতা কখনো অযথা ছিঁড়ব না বা নষ্ট করব না। কাগজের দুই দিকই সুন্দর করে ব্যবহার করব।

তোমরা জানলে অবাক হবে যে, ১৯৬৯ সালে সান্তা বারবারায় একটি মস্ত বড়ো তেলের খনি দুর্ঘটনায় সাগরের পানি ও পরিবেশের ভীষণ ক্ষতি হয়েছিল। তা দেখে আমেরিকার গেইলর্ড নেলসন নামের এক পরিবেশবাদী ঠিক করলেন যে, পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য সবাইকে সচেতন করতে হবে। তাঁর ডাকেই ১৯৭০ সালের ২২শে এপ্রিল প্রথমবারের মতো প্রায় ২ কোটি মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছিল পৃথিবীকে ভালোবাসার কথা বলতে। সেই থেকেই শুরু হয় বিশ্ব ধরিত্রী দিবস! বন্ধুরা, এই ধরিত্রী দিবসে প্লাস্টিকের পলিথিন ব্যবহার একদম বন্ধ করে দাও। পুরোনো কোনো সুতির জামা বা চটের বস্তা কেটে মা-বাবার সাহায্য নিয়ে নিজেই বানিয়ে নিতে পারো একটি সুন্দর কাপড়ের ব্যাগ। তাতে রং-পেনসিল দিয়ে এঁকে দিতে পারো একটি সুন্দর গাছের ছবি! দেখবে তোমাদের মনটাও অনেক ভালো লাগবে। সবাই মিলে একসাথে বলি-'শুভ ধরিত্রী দিবস! সুস্থ থাকুক আমাদের পৃথিবী!'

# পহেলা বৈশাখ

## মুনছুর আহমেদ বিপ্লব

এসো হে বৈশাখ
গাই নতুন দিনের গান
বাংলার মাঠে জাগে
আনন্দ আর উল্লাসের আহ্বান।

নতুন দিনের আগমনে
হাসে সবার মুখ
নতুন বছরের প্রার্থনায়
দূরে যাক সকল দুখ।

গ্রামের পথে বাজে
বাঁশির মিষ্টি তান
মেলায় মেলায় ভাসে
আনন্দের জয়গান।



মোহাম্মদ ইউসুফ তুর্য, দশম শ্রেণি, জুনিয়র এইড স্কুল, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা



সামাইরা নূর, নার্সারি শ্রেণি, লাইন্স অগ্রগতি শিক্ষা নিকেতন, মিরপুর, ঢাকা



তালবিয়া জিনাত রহমান তেহামি, চতুর্থ শ্রেণি, সরকারি প্রমথনাথ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী



মারিয়াম হোসেন (জিনুম), তৃতীয় শ্রেণি, রইছ উদ্দিন একাডেমি, শেরপুর

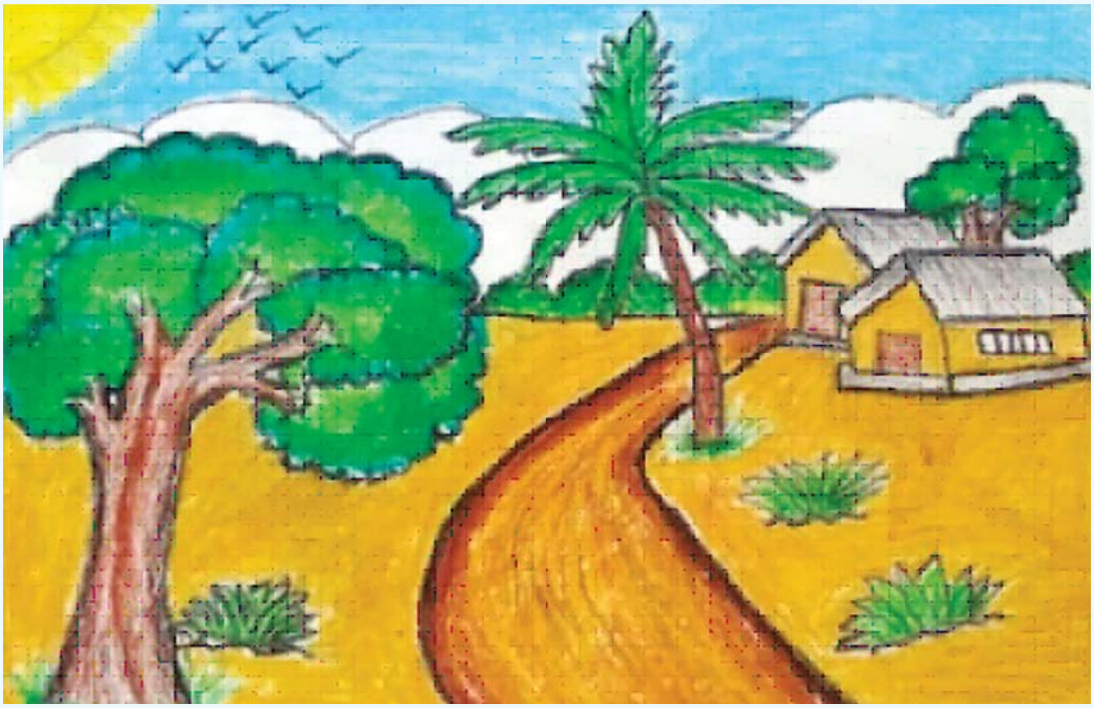

তাসনিম জাহান রাদিয়া, পঞ্চম শ্রেণি, নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নাটোর



মারিয়া হায়দার দিতু, অষ্টম শ্রেণি, দারুস দাখিল মাদরাসা, পবা, রাজশাহী



সাফওয়ান আল আফিফ, প্রথম শ্রেণি, চিলড্রেন একাডেমি, হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর

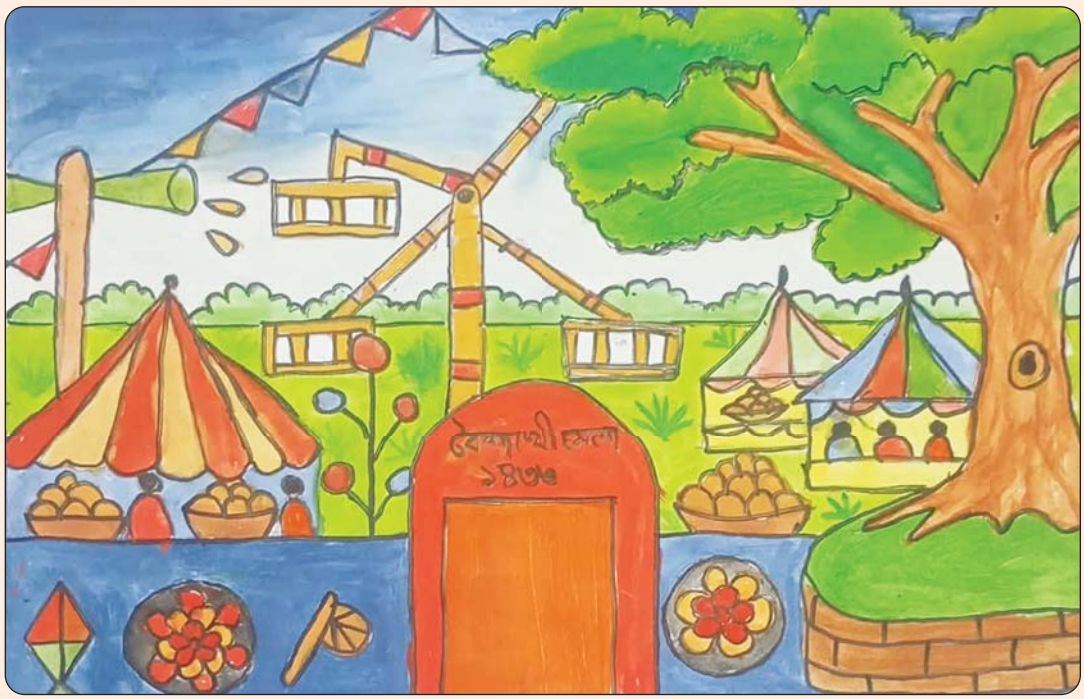

শামরিন আনজুম তোয়া, চতুর্থ শ্রেণি, খুশিউরা সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয়, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-50, No-10. April 2026, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022




ফারদিনুল আসনান, সপ্তম শ্রেণি, সিংগাইর নিউ মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, মানিকগঞ্জ

**চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর**
**তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়**
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা